গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১০ - ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিমানবন্দরকর্মীদের ধর্মঘটের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি

লড়াইয়ে আন্তরিক কর্মচারীরা, নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতক

দেশের দুটি লাভজনক এবং স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ করার যে জনবিরোধী সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার নিয়েছে, তার প্রতিবাদে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা দেশের ২২ হাজার বিমানবন্দর কর্মচারীর ৯৬ ঘন্টা কর্মবিরতি আন্দোলন সরকারকে প্রবল চাপের মধ্যে ফেললেও রাজনৈতিকভাবে বেসরকারীকরণের সমর্থক নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিচারিতার জন্য এই আন্দোলন সফল পরিণতিতে পৌঁছানোর আগেই প্রত্যাহার করা হল। কর্মচারীরা অর্ধপথে এইভাবে আন্দোলনের সমাপ্তি একেবারেই চাননি। লড়াইয়ে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; রাষ্ট্রের দমনশক্তি পুলিশ ও সি আর পি এফের আক্রমণ মোকাবিলা করে, এসমা জারির হুমকি উপেক্ষা করে, দিল্লি হাইকোর্টের আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশকে গ্রাহ্য না করে অনমনীয় তেজে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নেতৃত্ব আন্দোলনের রাশ টেনে ধরলেন। ফলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আন্দোলনের সমাধি ঘটল। যে মুখ্য দাবি নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে কোনও আলোচনাই হল না। সরকারের তরফে কিছু শুকনো প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই নেতৃত্ব আপস করে আন্দোলন তুলে নিলেন। সরকার যথারীতি বেসরকারীকরণের কাজ সেরে ফেলেছে, বরাতের কাগজপত্র দ্রুত তুলে দিয়েছে নির্দিষ্ট কোম্পানিগুলির হাতে।

এই ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল, বিমানবন্দর দু'টি বেসরকারীকরণ করা চলবে না। কেন্দ্রের সি পি এম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার আধুনিকীকরণের নামে দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দর ভারতীয় ও বিদেশি যৌথ মালিকানার দু'টি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই দু'টি সংস্থার হাতে শুধু আধুনিকীকরণেরই বরাত দেয়নি, সংস্থাকে দিয়েছে শ্রমিক নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ের অধিকার। অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল খোলাখুলিই বলেছেন, এখন থেকে এই দুই বিমানবন্দরের কর্মীরা ৩ বছর পর্যন্ত বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার অধীনে ডেপুটেশনে কাজ করবেন। ৩ বছর বাদে ৬০ শতাংশ কর্মীকে নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ মন্ত্রীর কথাতেই পরিষ্কার যে, ৪০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই হবেন। তাছাড়া, যে ৬০ শতাংশ কর্মীকে নতুনভাবে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে, তার সবাইকে নিয়োগ করা হবে কিনা, নিয়োগ হলেও তা স্থায়ী হবে কিনা, নাকি চুক্তির ভিত্তিতে কম বেতনে বেশি খাটানো হবে, পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ থাকবে কিনা— এককথায় চাকুরির নতুন শর্তাবলী কী হবে, তা নিয়ে গভীর আশঙ্কাই একযোগে কর্মচারীদের আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য করেছে।

এই আন্দোলনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নরকম শক্তিই ছিল। কিন্তু বেসরকারীকরণের বিরোধিতায় সকলেই ছিল এককাট্টা। বুর্জোয়াশ্রেণী, বুর্জোয়া দল এবং বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ও ব্যক্তিবর্গ সংস্কারের মানবিক মুখের কথা বললেও, সংস্কার যে বেসরকারীকরণকে ডেকে আনে এবং তা যে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ধারালো খড়্গ, এ'কথা শ্রমিক-কর্মচারীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। তাই, হয়

সাতের পাতায় দেখুন

ধর্মঘট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি

আধুনিকীকরণের নামে দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দর বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে বিমানবন্দর কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, নির্মম নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের সর্বশেষ রূপ হিসাবে যে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এসেছে, তারই পরিপূরক নীতি হিসাবে দেশের সকল বিমানবন্দরকে ক্রমে ক্রমে বেসরকারীকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার এবং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের নামে সেই লক্ষ্যের দিকেই সরকার নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। জনপরিষেবামূলক সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের একের পর এক বেসরকারীকরণ করার সপক্ষে সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় দক্ষতা আনার ও সংস্থাগুলিকে লাভজনক করার যে যুক্তি দিচ্ছে, তা বাস্তবে ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। আসলে জনসাধারণের অর্থে তৈরি রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকে এখন নামমাত্র মূল্যে দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়াই সরকারের প্রকৃত মতলব। বলাবাহুল্য যে, উচ্চ মুনাফালোভী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ব্যাপক জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি কোনওরকম দায়বদ্ধতা না রেখে, জনপরিষেবামূলক সংস্থাগুলিকেও কেবল বিপুল মুনাফা লুটবার ক্ষেত্রে পরিণত করবে। বেসরকারীকরণের পরিণামে মালিকরা 'অতিরিক্ত কর্মচারী'র ধুয়া তুলে বিপুল ছাঁটাই ও কর্মী সঙ্কোচনই কেবল করবে না, পণ্য ও পরিষেবার দামকেও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে। এই সবকিছুর সামগ্রিক পরিণামে গোটা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর আশা নিশ্চিতভাবেই মার খাবে।

কমরেড মুখার্জী বলেন, দেশব্যাপী সংগঠিত লাগাতার ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই ভয়াবহ পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে হবে। সেজন্য এই আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব চাই যাতে আন্দোলনকে দাবি আদায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, মাঝপথে আন্দোলন ভেস্তে দিয়ে কায়েমি স্বার্থকে খুশি করা না হয়। দেশের সকল মেহনতী মানুষকে বিমান শিল্পের সংগ্রামী ভাইদের পাশে দাঁড়াতে ও নিজেরা সংগঠিত হয়ে যৌথ সংগ্রামের মঞ্চ থেকে আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হতে কমরেড মুখার্জী আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার যেহেতু সিপিএম-সিপিআই-এর সমর্থনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, সেহেতু এই দলগুলির নেতারা, যাঁরা বেসরকারীকরণের সর্বনাশা সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁদের এখনই বিমানবন্দর বেসরকারীকরণের নীতি বাতিলে সরকারকে চাপ দিয়ে বাধ্য করতে হবে। অন্যথায়, তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিচারিতাকে জনগণ মার্জনা করবে না।

বেকারদের কাজের ও মদের ঢালাও লাইসেন্স বন্ধের দাবিতে যুব বিক্ষোভ

৩১ জানুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কয়েক হাজার যুবক যুবতী উপস্থিত হয়েছিলেন কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে। যে অসংখ্য সমস্যা আজ ব্যর্থ করে দিচ্ছে যৌবনের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেই সমস্যার প্রতিকারের দাবিতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা সেদিন এসেছিলেন। সুদূর দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকা থেকে, পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার রুক্ষ অঞ্চল থেকে, সুন্দরবন-মেদিনীপুর-হুগলি-হাওড়া — রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকেই।

রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭০ লক্ষ, সারা দেশে কয়েক কোটি। নথিবহির্ভূত সংখ্যাটা এর থেকেও অনেক বেশি। দেশের স্বাধীনতার অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল — সকল মানুষ উপযুক্ত কাজ পাবে, আর কোটি হাতের ছোঁয়ায় গোটা দেশ মেতে উঠবে এক সৃষ্টি যজ্ঞে ; কাউকে অনাহারে থাকতে হবে না, কেউ মারা যাবে না বিনা চিকিৎসায়। স্বাধীন দেশে কর্মহীন যুবককে নিরুপায় হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হবে — এমন স্বাধীনতা কেউ চায়নি। অথচ স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও যুবসমাজের বিরাট অংশ কর্মহীনতার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শিক্ষা, চিকিৎসা আজ মুনাফার পণ্য — শুধুমাত্র ধনিকশ্রেণীর কুক্ষিগত। কল-কারখানা, খনি, নদী, বন — সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেশি-বিদেশি বেনিয়াদের কাছে। কিন্তু কেন এমন হল? কেন শত-সহস্র প্রাণের আহুতি এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল? এর হাত থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী? কে দেবে এর উত্তর? উত্তর দিলেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখালেন, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী। সর্বোচ্চ মুনাফাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মুনাফার এই লোভ চরিতার্থ করতেই তারা একদিকে যেমন ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তেমনই শ্রমিক কৃষক-সাধারণ মানুষের ওপর চালাচ্ছে তীব্র শোষণ। মানুষের ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতাটুকুও

দুয়ের পাতায় দেখুন

৩১ জানুয়ারি ধর্মতলা অভিমুখে এ আই ডি ওয়াই ও'র মিছিল

খড়্গপুরে হকার আন্দোলন

২০০৪ সালের ২০ জানুয়ারিতে ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় হকার নীতিতে বলা হয়েছিল, সরকার হকারদের সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে সমাধান করবে, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না, সহজ কিস্তিতে ব্যাঙ্ক লোন, পি এফ ইত্যাদির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। কিন্তু দীর্ঘ দু'বছর পরেও তার কিছুই করা হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় হকার সংগঠন এন এ এস ভি আই এবং সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বানে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ-ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। খড়্গপুর ডি আর এম দপ্তরে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে দোকানদার সমিতির উদ্যোগে বিশাল হকার মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সহস্রাধিক হকারের এই মিছিলে লক্ষণীয় ছিল কয়েকশত মহিলা হকারের অংশগ্রহণ।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিশির ঘোষ। বক্তব্য রাখেন শঙ্কর দাস, অমল মাইতি, ভানুরতন গুঁই, শঙ্কর মালাকার, শীতল মাইতি, শৈলেন দে। এছাড়া রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, আন্দুল, চেঙ্গাইল, উলুবেড়িয়া, কুলগাছি, ঘোড়াঘাটা, ভোগপুর, পাঁশকুড়া, ক্ষিরাই, হাউড়, বালিচক, শ্যামচক, জকপুর স্টেশনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। ডি আর এম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

মুর্শিদাবাদ

পরিচারিকা হত্যার প্রতিবাদ

কিশোরী পরিচারিকা মণিকা রায়ের খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৩০ নভেম্বর বহরমপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মহিলা। উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর মধুপুর রায়কাননে অভিজিৎ দাসের বাড়িতে কর্মরতা ঐ কিশোরীকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয় বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। অনিচ্ছুক থানা এস পি-র হস্তক্ষেপে ৯ ডিসেম্বর অভিযোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেনি। তারই প্রতিবাদে পরিচারিকাদের এই অবস্থান-বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন মণিকার মা রূপা রায়, বীথিকা দাস, পরিচারিকা সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্যা রাধা মিত্র, এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার, রত্না বাগচী প্রমুখ। জেলাশাসকের কাছে তাঁরা একটি স্মারকলিপি দেন।

বীরভূম

এআইডিএসও-র আঞ্চলিক সম্মেলন

কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি মাড়ওয়াড়ি ধর্মশালায় বোলপুর আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বোলপুর কলেজ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিধিত্ব করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী কমিটির সভানেত্রী কমরেড নমিতা দাস। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা, সরকারের নীতি এবং ডি এস ও-র প্রতিরোধ আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড আয়েষা খাতুন, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড বিজয় দলুই। সম্মেলনে মিঠুন সিংহরায়কে সভাপতি এবং ঋত্বিক মোদককে সম্পাদক করে ২০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। সমাপ্তিপর্বে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিশ্বরূপ সরকার ও কমরেড লালন দাস।

মেদিনীপুরে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের জয়

২৪ জানুয়ারি ক্ষুব্ধ বিদ্যুৎগ্রাহকরা অ্যাবেকার আহ্বানে পাঁশকুড়া সাপ্লাই অফিস ঘেরাও করে। তাঁদের দাবি ছিল ঃ দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা উপেক্ষা করে বিদ্যুতের লাইন কাটা চলবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রথমে দাবিগুলি মানতে অস্বীকার করলেও দাবির পক্ষে গ্রাহক সমিতির নেতৃত্বের যুক্তির এবং তিন ঘন্টা অবরোধ-ঘেরাও আন্দোলনের প্রবল চাপে পাঁশকুড়া সাপ্লাই অফিসের কর্তৃপক্ষ কাটা লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই জয় আবার প্রমাণ করল সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দাবি আদায় করতে পারে।

দক্ষিণ ২৪-পরগণা

বৃত্তি পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, বাসন্তী শাখা ২০০৪-০৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করে। এই উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন তপন বিশ্বাস, কান্তিলাল দেবনাথ, তপন কুণ্ডু, ডাঃ পঙ্কজ হালদার, সজল দেব ও নির্মল সরকার।

অনশনকারীদের সংবর্ধনা সভা

অ্যাবেকার ডাকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আমরণ অনশন আন্দোলনে এলাকার অংশগ্রহণকারীদের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২১ জানুয়ারি হরিহরপাড়ায়। সংগঠনের বহড়ান শাখার সম্পাদকসহ ১৬জন কৃষকের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করেন বিভিন্ন গণসংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সভায় উপস্থিত সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক অপূরিত দাবি আদায়ের আন্দোলনে অবিচল থাকার শপথ নেন।

তিনটি জুট মিলে বেআইনি লকআউট

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ৩১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকতোষণ নীতির ফলশ্রুতিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ যে ভয়াবহ মালিকী আক্রমণের শিকার তার উদাহরণ হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুট মিল, ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ার ভিক্টোরিয়া জুট মিল এবং ত্রিবেণীর কেশোরাম রেয়ন কারখানা। এই কারখানাগুলির মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করতে চূড়ান্ত বেআইনিভাবে কতগুলো ভিত্তিহীন অজুহাত তুলে লকআউট জারি করেছে। ফলে ইন্ডিয়া জুট মিলের ৪৫০০ জন এবং ভিক্টোরিয়া জুট মিলের ৫০০০ জন শ্রমিক তাদের ন্যায্য ডি এ দাবি করার 'অপরাধে' আজ পরিবারসহ উপার্জনহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ঠিক তেমনি কেশোরাম রেয়নের মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবিসনদের কোন সুষ্ঠু ফয়সালা করছে না এবং অবসর নেওয়ার পর শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটিও দিচ্ছে না — দাবিসনদের ফয়সালা ও গ্র্যাচুইটি দাবি করার 'অপরাধে' কেশোরামের শ্রমিকরা আজ গেটের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীরব দর্শক।

আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অবিলম্বে এই তিনটি কারখানার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লকআউটকে বেআইনি ঘোষণা করার এবং যাতে সব শ্রমিককে নিয়েই কাজ চালু হয় তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।"

বর্ধমানে জেলাশাসকের দপ্তরে হকারদের ডেপুটেশন

জাতীয় হকার নীতি অনুযায়ী হকারদের উপযুক্ত পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করা চলবে না, হকারদের সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক লোন এবং পি এফ, পেনশন ও সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে, ইত্যাদি দাবিতে বর্ধমানে জেলাশাসকের কাছে সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার পক্ষ থেকে গত ১৯ জানুয়ারি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছালে পুলিশ পথ আটকায়। সুব্রত বিশ্বাস, সুরজিত দাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেনারেল)-এর সাথে আলোচনা করে। জাতীয় হকার নীতি সম্বন্ধে জেলাশাসক দপ্তরে কোন সংবাদ নেই জেনে সমবেত হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিস্ময়ে ও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে সমিতির কাছ থেকে জাতীয় হকার নীতির ফটোকপি নিয়ে গেলে এ ডি এম আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

যুব বিক্ষোভ থেকে ব্যাপক আন্দোলনের ডাক

একের পাতার পর

থাকছে না। এইভাবে তারা নিজেরাই শিল্পে সঙ্কট ডেকে আনছে। তাই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, হাজার হাজার ছোট-মাঝারি কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির কোষাগারে পুঁজির পাহাড় জমে উঠছে। রাজ্যের বিরাট সংখ্যক বেকার যুবক কাজের সন্ধানে ছুটছে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও। দালালচক্রের হাতে পড়ে বেশিরভাগই প্রতারিত হচ্ছে — সেখানে ন্যূনতম বেতন নেই, কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। বিপিএল তালিকাভুক্ত বেকারদের পরিবার পিছু ১০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতির হাল কী হবে কেউ জানে না। বেকার যুবক-যুবতীদের কাজ দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে সরকার স্বনিযুক্তির নানা প্রকল্প ঘোষণা করেছে, যে প্রকল্পের ঋণ নিয়ে যুবকরা বৃহৎ পুঁজির সাথে এঁটে উঠতে না পেরে সর্বস্ব হারিয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে পুলিশি হয়রানির শিকার হচ্ছে, এমনকী অনেকে অনন্যোপায় হয়ে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে এই বিরাট বেকারবাহিনী যাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য সিপিএম পরিচালিত সরকার মুখে প্রগতিশীলতার অনেক কথা বললেও রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতে মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে, অনলাইন লটারি নামক সর্বনাশা জুয়াকে অবাধে চলতে দিচ্ছে। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম — সর্বত্র নোংরা সিনেমার ছড়াছড়ি। এর ফল হিসাবে বেড়ে চলেছে চুরি, ছিনতাই, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, অপরদিকে জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা। উদ্বেগজনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে সমাজের রুচি-সংস্কৃতির মানটি। উদভ্রান্ত যুবসমাজ যখন পাগলের মতো রোজগারের কোন একটা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শাসক রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভোট জালিয়াতির কাজে লাগাচ্ছে, ভাড়াটে গুণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করছে।

যুবজীবনের এই সমস্যাগুলি নিয়ে বৃহৎ সংগঠনের দাবিদার শাসক সিপিএমের অনুগামী ডি ওয়াই এফ আই, অথবা যুব কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ভূমিকা কী? কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও গোপনে এইসব সংগঠনগুলি মদ-জুয়ার ব্যবসায়ীদের মদত দিয়ে চলেছে।

এইরকম একটি শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এ আই ডি ওয়াই ও। সকল বেকারের কাজ অথবা বেকার ভাতা, মদের লাইসেন্স বন্ধ ও লটারি-জুয়া-সাট্টা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে যুব সমাজকে সংগঠিত করে আন্দোলন চালাচ্ছে তারা। এলাকায় এলাকায় কনভেনশন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, যুব কমিটি গঠন, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, পিকেটিং প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যুব জীবনের সমস্যাগুলি তুলে ধরছে।

এরই ধারাবাহিকতায় তারা ডাক দিয়েছিল এই যুব বিক্ষোভের। সেদিন হাজার হাজার যুবক-যুবতী কলেজ স্কোয়ার থেকে সুসজ্জিত মিছিল সহকারে পৌঁছান এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলে। ব্যানারে, ফেস্টুনে, শত কণ্ঠে স্লোগান ওঠে — মদ নয়, কোটি হাতে কাজ চাই; মদের লাইসেন্স নয়, প্রতিটি এলাকায় খেলার মাঠ, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও সুস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত বেকারের পরিচয়পত্র ও ট্রেনে-বাসে-ট্রামে কনসেসন দিতে হবে।

বহুদিন আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী স্মারকলিপি নিতে উপস্থিত থাকেননি। গণআন্দোলনের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র নিন্দা করে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি সদাই ব্যস্ত, বেকার যুবক-যুবতীদের সমস্যা নিয়ে তাঁর ভাবার সময় কোথায়! তিনি বলেন, এই সরকার জনগণের সরকার নয়, জনবিরোধী সরকার; কোন আবেদন-নিবেদনে এই সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা যাবে না। এই সরকার একটি ভাষাই বোঝে — তা হল আন্দোলনের ভাষা। সেই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সর্বস্তরের যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তীব্রতর আন্দোলনের পথে আমরা আবারও আসবো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। এবং সেই সংগঠিত শক্তির কাছে সরকার মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার, সহ সভানেত্রী কমরেড নাজমা খন্দকার, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর প্রমুখ যুব নেতৃবৃন্দ।

মহাজোট হল না, হলেও কি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হত

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম বিরোধী কংগ্রেস-তৃণমূল মহাজোট আপাতত বিশ বাঁও জলে। ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনাও ক্ষীণ। সিপিএমের চূড়ান্ত জনবিরোধী ও অবামপন্থী শাসনের পরিণামে গত ৩০ বছর ধরে জনমনে যে বিক্ষোভ জমতে জমতে মারাত্মক রূপ নিয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে মহাজোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস উভয়েই। মহাজোট গঠনের পক্ষে সামিল হয়েছিল বিজেপিও। মহাজোট হলনা, এটা বাস্তব কিন্তু যদি এই তিনটি দলের দ্বারা বাস্তবে মহাজোট গড়েও উঠতো তাহলেও কি সেই মহাজোট জনগণের প্রত্যাশা সত্যিই পূরণ করতে পারত ?

কংগ্রেসের ইতিহাস নতুন করে বলার কিছু নেই। স্বাধীনতার পর একটানা অনেকগুলি বছর ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস মালিকশ্রেণীর হয়ে জনগণের ওপর পুঁজিবাদী নির্মম শোষণের ভিতকে মজবুত করেছে, জনগণের ন্যায়সংগত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনগুলিকে গলা টিপে মেরেছে, দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার একের পর এক কেড়ে নিয়েছে। এই কংগ্রেসী শাসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই পশ্চিমবাংলার মানুষ একদিন কংগ্রেসকে পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে নির্বাসিত করেছিল। সর্বভারতীয় স্তরে এবং অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের পরাজয় কংগ্রেস শাসনের জনবিরোধী চরিত্রকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দল হিসাবে কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসনের সাবেকি ভিত আজ ভেঙে গেছে। বুর্জোয়ারা এখন সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস এবং বিজেপি — এই দুই দলের নেতৃত্বাধীন জোটকে বেছে নিয়েছে যাতে ক্ষমতাসীন একটি দলের জোট জনপ্রিয়তা হারালে বিরোধী অপরটিকে ক্ষমতায় আনা যায়।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপি 'সুশাসন', 'সুরাজ', 'পরিচ্ছন্ন প্রশাসন' প্রভৃতি কথা বললেও তাদের বিগত ৬ বছরের শাসন পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, এই কথাগুলি ছিল আসলে জনগণের প্রতি ভাঁওতা। উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোই শুধু নয়, বুর্জোয়াদের স্বার্থে কংগ্রেস আনীত উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ, ছাঁটাই ও শ্রমিকদের অধিকারহরণের উদ্দেশ্যে সংস্কার প্রভৃতি অসংখ্য জনবিরোধী কার্যকলাপের পরিণামে বিজেপিও কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নিজেকে প্রকৃত 'কংগ্রেস' হিসাবেই দাবি করে এবং কংগ্রেসী পুরনো ঐতিহ্যই বহন করে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসী দুঃশাসনের দায় এড়াতে পারেন না।

বিগত কয়েকমাস ধরে মহাজোট গঠনের যে তৎপরতা চলল, তাতে প্রথমদিকে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য শুনে অনেকের ধারণা হয়েছিল মহাজোট হচ্ছেই। মহাজোটের ব্যাপারে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জী, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, গনিখান চৌধুরীর বারবার বৈঠকও হয়েছিল। মহাজোটের পক্ষে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। গনিখান চৌধুরী তো প্রকাশ্যে বলেই ফেললেন, যদি এ আই সি সি মহাজোটের পক্ষে সায় না দেয়, তাহলে তিনি নিজের পথেই চলবেন। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিও বলেছিলেন, 'মমতার নেতৃত্বে মহাজোটের আশা ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে' এবং 'যাঁরা ভাবছেন মহাজোটের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল তাঁরা আসলে অনিল বিশ্বাসের স্তাবক।' এমনকী আগামী নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট করে তাঁরা নির্বাচনে লড়বেন, এমন কথাও বলেছিলেন। তৃণমূল নেত্রীরও বক্তব্য ছিল সিপিএমকে হারাতে হলে বিরোধী ভোট এককাট্টা হওয়া দরকার এবং সর্বত্র 'একের বিরুদ্ধে এক' লড়াই চাই।

মহাজোট নিয়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা মুখে যাই বলুন না কেন, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের, বিশেষ করে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল, তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এই মহাজোট বাস্তবে দাঁড়ানো কঠিন। কারণ, প্রথমত কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ব্যক্তিক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল এবং সম্পর্কের তিক্ততাও যথেষ্ট। বিশেষ করে এদের মধ্যে তিক্ততা গত বিধানসভা নির্বাচনের পর অনেক বেড়ে যায়। গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি-কে ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে নির্বাচনে লড়েছিল এবং সেই নির্বাচনের পর একের বিরুদ্ধে অপরের বিষোদ্গারে উভয়ের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। দ্বিতীয়ত, যে সিপিএমের সমর্থনের উপর কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার দাঁড়িয়ে আছে, কংগ্রেস সেই সিপিএমের বিরুদ্ধে মহাজোটে সামিল হতে পারেনা। বাস্তবেও তাই দেখা গেল। হায়দ্রাবাদে তাদের ৮২তম জাতীয় অধিবেশনে মহাজোটে সামিল না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস। মহাজোট যে হবেনা একথা প্রণব মুখার্জী, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিরা জানতেন না এমন নয়। তবুও জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সিপিএম বিরোধী মানসিকতা লক্ষ্য করে তাঁরা মহাজোটের পক্ষে বলছিলেন এবং একইসাথে তৃণমূলকে বিজেপি'র সঙ্গে জোটবন্ধন ছিন্ন করার শর্ত দিয়েছিলেন। তৃণমূল যে বিজেপি'র সঙ্গ ছাড়বে না, একথা কংগ্রেস নেতাদের একেবারে না বোঝার কথা নয়। তবুও এই শর্ত দিয়েছিলেন যাতে জোট না হওয়ার দায় তৃণমূলের ঘাড়ে চাপানো যায়। আবার তৃণমূল কংগ্রেসও জানত কংগ্রেস মহাজোটে সামিল হবে না। তবুও চেষ্টা চালিয়েছিল এটা দেখাতে যে, জোটগঠন না হওয়ার জন্য দায়ী কংগ্রেস। এইভাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ই পরস্পরের উপর দোষ চাপিয়ে সিপিএমবিরোধী ভোটব্যাঙ্কে যতটা সম্ভব থাবা বসানো যায় সে চেষ্টা করেছিল।

সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, মহাজোট হোক বা না হোক নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধকে গুরুত্ব না দিয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি মহাজোট গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা কি কোন নীতির ভিত্তিতে? সিপিএম ক্ষমতায় বসে যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলছে তার সাথে কংগ্রেস-বিজেপি'র কোন পার্থক্য নেই। তৃণমূলও কি তার বিরোধী? সিপিএম যখন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তিকেই ধসিয়ে দিল, তখন তৃণমূল কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেনি কেন? হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস নীরব কেন? বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলন কার্যত কোথায়? তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সিপিএমের মতই জনগণের উপর ট্যাক্সবৃদ্ধির বোঝা চাপাচ্ছে কেন? কংগ্রেসের 'সংস্কার' কর্মসূচি মেনে সিপিএম এরাজ্যে ভিআরএস, ইআরএস, ডাউন সাইজিং, কর্মী ও কর্মসঙ্কোচনের যে যজ্ঞ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তৃণমূল একটি কথাও বলছে না কেন? কারণ সিপিএমের এই সমস্ত জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তৃণমূলের কোন নীতিগত বিরোধ নেই এবং সেই কারণে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনও নেই। তাহলে তৃণমূলের একমাত্র রাজনীতি হচ্ছে অন্ধ সিপিএম বিরোধিতা। এই অন্ধ সিপিএম বিরোধিতার দ্বারা তৃণমূলের গদির রাজনীতি পুষ্ট হতে পারে, জনস্বার্থ রক্ষা বিন্দুমাত্র নয়।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকেই তৃণমূলের জন্ম, ক্ষমতার স্বাদ পেতেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তৃণমূলের সিপিএম বিরোধিতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারে শুধুমাত্র মন্ত্রী হওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক বিজেপির জোটে সামিল হওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে তৃণমূলই প্রমাণ করে দিয়েছে তার মূল লক্ষ্য কেবল রাইটার্সে যাওয়া। তার এই রাইটার্স দখলের মতলবের সঙ্গে জনস্বার্থের কী সম্পর্ক? তৃণমূল সিপিএমের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর বহু কথা বললেও সিপিএমের জনবিরোধী আর্থিক নীতির মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর কথা ভুলেও বলে না।

বিজেপি ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অস্ত্রকেনা নিয়ে কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেস সেই প্রশ্ন তুলে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে তোলে। এক্ষেত্রেও তৃণমূলের বিবেচনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন পূরণ হল না তখন তৃণমূল কী করল? অস্ত্র কেলেঙ্কারীর অন্যতম নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতাদের কার্যত কয়েক মাস তোয়াজ করে আবার এন ডি এ'র মন্ত্রীসভায় ঢুকল। এবং কিছুদিন দপ্তরহীন মন্ত্রী থেকে নির্বাচনের মাসখানেক আগে কয়লামন্ত্রক পেল। মন্ত্রীত্বের ক্ষমতার জন্য তৃণমূল যে নিজেকে কত অসম্মানজনক অবস্থায় অবনমিত করতে পারে, এই সময়ের ঘটনা তা দেখিয়ে দেয়। সুতরাং এবারের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার জন্য তৃণমূল যে নীতিহীন জোট গঠনে প্রয়াসী হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

এখন যে বিষয়টি বিবেচনার তা হল, যে কথা আমরা শুরুতেই বলেছি, যদি মহাজোট বাস্তবে গড়েও উঠতো এবং তা সিপিএমকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসতো তাহলে তার দ্বারা জনজীবনের সমস্যাগুলির কোন সমাধান হত কি? এই মহাজোটের দুই প্রধান চালিকা শক্তি কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস যখন একত্রিত ছিল তখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে জনসাধারণের তিক্ত অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। সেই কংগ্রেসী ভাবধারায় পুষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস জনসাধারণকে নতুন কী শাসন উপহার দিতে পারে? তাছাড়া এই তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রে এনডিএ সরকারে থেকে সমস্ত জনবিরোধী কার্যকলাপ চালাতেই সাহায্য করেছে। বাজপেয়ী সরকারের সর্বনাশা কোন নীতিরই প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেস করেনি। এমনকী গুজরাটে যখন নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর বিজেপির আরএসএস, বজরং বাহিনী প্রায় দুমাস ধরে হামলা চালাল, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, খুন ধর্ষণ চলল, সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য বাজপেয়ী সরকারের উপর তৃণমূল কংগ্রেস কোন চাপই সৃষ্টি করেনি। বাজপেয়ী সরকারের শরিক হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস এই দায় এড়াতে পারে কি। এখন ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের কথা বলে তার অপরাধ স্খালন করতে চাইছে।

পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে এর পরিবর্তন অবশ্যই জরুরি। কিন্তু যাঁরা সিপিএমের অপশাসনের পরিবর্তন চান তাঁদের একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে, একই বুর্জোয়া শাসন, যদি নতুন মোড়কে মহাজোটের নামে আসে তাহলে শুধু শাসক পাল্টে, মন্ত্রীসভা পাল্টে জনগণের কী লাভ? আমরা কংগ্রেসকে হঠিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছি। কী লাভ হয়েছে ? শোষণ-জুলুম অব্যাহত, শুধু শোষক পাল্টেছে। এই ধরনের পরিবর্তনে জনসাধারণের কোন লাভ তো হয়ই না, উল্টে জনসাধারণের মধ্যে হতাশার জন্ম হয়। আজ সিপিএমের পরিবর্তে তথাকথিত মহাজোট যদি ক্ষমতায় আসে এবং একই শোষণ অব্যাহত থাকে তাহলে এই পরিবর্তনের কী ফলশ্রুতি ? ব্যক্তি ঈর্ষা থেকেপরিবর্তনের ভাবনা নয়, সিপিএমের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে বুর্জোয়া শাসন-শোষণ-জুলুম চলছে তার পরিবর্তন দরকার। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তন বুর্জোয়া দলগুলির মহাজোট আনতে পারেনা।

গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ পুঁজিপতিদের সংগঠন সি আই আই-এর মঞ্চ থেকেই শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং যোগেশ চন্দ্র দেবেশ্বর দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'মৃতপ্রায় বাংলার জীবনদায়ী ওষুধ' হিসাবে তুলে ধরেন। সিপিএমের শাসনে কেমন তরতরিয়ে 'উন্নয়ন' হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেন শিল্পপতি দেবেশ্বর। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় সিপিএম পশ্চিমবাংলায় যে উন্নয়নের কথা বলে সেটা কার উন্নয়ন? উন্নয়ন হচ্ছে যে পুঁজিপতিশ্রেণীর এবং তারাই এই উন্নয়নের রূপকার বুদ্ধদেববাবুর জয়গান গাইছে। আর গ্রাম-শহরে পঞ্চায়েতের, প্রশাসনের নানা সুবিধাকে কুক্ষিগত করে যারা আখের গুছিয়ে নিয়েছে সিপিএমের ভাষায় যারা 'নব্য ধনিক শ্রেণী', উন্নয়ন হচ্ছে তাদের। এরাই চায় সিপিএম বারবার জিতুক।

সুতরাং, সিপিএমের ক্ষমতায় থাকার ভিত্তি যে পুঁজিপতিশ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা — একথা আজ আর গোপন নেই। আবার পুঁজিপতিশ্রেণী এটাও বোঝে যে, কোন একটা দলকে দিয়ে অনন্তকাল ধরে এই শোষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে একটি দল জনপ্রিয়তা হারালে তার পরিবর্তে আরেকটি দল — যে বুর্জোয়াদের স্বার্থই দেখবে — তাকে ক্ষমতায় বসায়। শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য শুধু এদেশেই নয়, বিশ্বের দেশে দেশে এমন দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টির রাজনীতি চলছে। সর্বভারতীয় স্তরে ইউপিএ জোট এবং এনডিএ জোট বুর্জোয়াদের আকাঙ্খিত দ্বিদলীয় রাজনীতিরই প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গেও বুর্জোয়ারা সিপিএম ফ্রন্টের বিকল্প বুর্জোয়াদের আরেকটি দল বা জোট অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন মনে করছে যাতে সিপিএম বিরোধী বিক্ষোভ গণআন্দোলনের পথে না যায়। জোট গঠনের নেপথ্যে পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ভাবনা যেমন কাজ করছে, তেমনি পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে এই ভাবনাও প্রধানরূপে রয়েছে যে, গণআন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হলে তা সম্ভব সিপিএমকে দিয়েই। কারণ সিপিএমের হাতে লালঝাণ্ডা, মুখে বামপন্থা, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের স্লোগান থাকায় তার পক্ষে শ্রমিকদের প্রতারণা করা সহজতর। ফলে যতদিন সম্ভব বুর্জোয়ারা পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমকেই চাইছে। এই কারণে পুঁজিপতিশ্রেণীর রিমোট কন্ট্রোলিং-এ — একেবারে কোনমতেই ক্ষমতায় রাখা সম্ভব নয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত — মালিকশ্রেণীর মদতে সিপিএমকেই মালিকশ্রেণী ক্ষমতায় রাখতে চাইবে।

মনে রাখা দরকার, নির্বাচন একটি রাজনৈতিক লড়াই। এই নির্বাচনকে 'কে সরকার গঠন করতে পারবে, কে পারবে না' শুধু এই ভাবনার মধ্যে আটকে রাখলে শোষিত জনগণেরই ক্ষতি। বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদীরা এভাবে ভাবতে পারে, কিন্তু শোষিত জনগণ এভাবে ভাবলে কোনদিনই মুক্তির পথ দেখতে পাবেন না। গণআন্দোলন ছাড়া শোষিত জনগণের বাঁচার কোন পথ আর খোলা নেই; সেই কারণে নির্বাচনেও শোষিত জনগণের কর্তব্য হবে গণআন্দোলনের শক্তিকেই বলীয়ান করা।

একথা ঠিক, যতদিন পর্যন্ত না জনগণ নিজস্ব সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে সংঘবদ্ধ জনশক্তির জন্ম দিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নির্বাচনে বুর্জোয়াদের স্বার্থবাহী কোন না কোন দল জিতবে এবং একইভাবে জনবিরোধী শাসন চাপিয়ে দেবে। লড়তে হবে তার বিরুদ্ধেও। শোষণের এই চক্র থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের ঝাণ্ডা এস ইউ সি আই বহন করছে। সুতরাং, জোটের ভ্রান্ত কানাগলিতে পথ হারানো নয়, গণআন্দোলকে শক্তিশালী করাই হবে শোষিত জনসাধারণের আশু কর্তব্য।

হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন

পুঁজির স্বার্থে নীতি নির্ধারণই মূল লক্ষ্য

সিপিএম ও তার দোসর বামপন্থী দলগুলির নেতারা নিজেদের কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের প্রাণভোমরা ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সভায় প্রায়শই চড়াগলায় হুমকি দিচ্ছেন যে, তাঁদের কথা না শুনলে কেন্দ্রের সরকারের পরিণতি ভাল হবে না। কিন্তু সে হুমকির অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে অন্তত কংগ্রেস নেতাদের যে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না, তা আবারও প্রমাণিত হল হায়দ্রাবাদে কংগ্রেসের সদ্যসমাপ্ত ৮২তম অধিবেশনে। ইউ পি এ সরকারের নীতি নির্ধারণে সিপিএম-সিপিআই নেতাদের 'বিকল্প নীতি'র পরামর্শ গ্রহণের দাবিও যে কতখানি মূল্যহীন তাও এই অধিবেশনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণের মূল অর্থনৈতিক নীতিতেই কংগ্রেসের অবিচল থাকার সিদ্ধান্তে অবশ্যই 'মানবিক মুখ' নামক আড়ালের কথা যথারীতি বলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাতে। এই সরকারের বয়স হল ২০ মাস। এই সময়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দেখা দিয়েছে, সরকারের নীতিগত অবস্থান নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত, আর্থিক নীতি, বৈদেশিক নীতির বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। যেহেতু এই অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গিই আগামী দিনে সরকার পরিচালনার 'গাইড লাইন' হিসাবে কাজ করবে, তাই অধিবেশন ঘিরে কিছুটা আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পর থেকে গত প্রায় ৬০ বছরের মধ্যে ৫০ বছরের মতো কংগ্রেস দলই দেশ শাসন করেছে। ফলে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তার প্রধান দায় কংগ্রেসকেই নিতে হবে। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস পুঁজিবাদকেই সংহত করেছে, পুঁজিবাদের বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একের পর এক নীতি গ্রহণ করেছে। এর অনিবার্য পরিণামে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর পুঁজি ক্রমাগত স্ফীত হয়েছে। দেশে বড় বড় একচেটে পুঁজি ও ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। আর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিষহ পরিস্থিতি। নিজেদের পুঁজিবাদী চরিত্র দেশের সাধারণ মানুষের চোখ থেকে আড়াল করতেই কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে অতীতে কখনও উঠেছে 'আবাদী সমাজতন্ত্র' ও 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদে'র স্লোগান, কখনও 'গরিবি হঠাও' বা 'বিশ দফা কর্মসূচি'র মতো তথাকথিত মানবিক স্লোগান। এইসব বুলিতে জনগণ বারবার ঠকেছে, সেই সুযোগে বিপুল মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে পুঁজিপতিরা। কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিতে 'গরিবি হঠাও' তো দূরের কথা, গরিবি আজ দেশ জুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কংগ্রেস যখন পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের শরিক হয়েছে, তখন 'সমাজবাদ', 'গরিবি হটাও' এসব স্লোগান ফেলে দিয়ে 'সংস্কার ও উন্নয়নে'র ধূয়া তুলেছে। আবার এই 'সংস্কারে'র সর্বনাশা ফলাফল আজ যখন প্রকট, তখন জনগণকে ভাঁওতা দিতে এসেছে 'মানবিক সংস্কার'।

কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনের মঞ্চ থেকে উত্থাপিত আর্থিক প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে উল্লেখ করা হয়েছে কর্মসংস্থান, দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণ, স্বাস্থ্যপ্রকল্প প্রভৃতি জনদরদের বহু কর্মসূচি। সবচেয়ে জোরের সাথে উল্লিখিত হয়েছে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কথা। এই প্রকল্পে বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার পিছু ১ জনের ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও শিশুশ্রমিক প্রথা রদ, শিশু ও মহিলাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়ে এমন জায়গায় মদ বন্ধ, শহরের কর্মরত শ্রমিকদের থাকার জন্য সাময়িক বাসস্থান গড়া — 'হরেকরকমবা' আরও অনেক এমন ভাল ভাল কথা দেশের মেহনতিমানুষের জন্য অধিবেশন মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যেন দেশের আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের পথ খোঁজাই ছিল কংগ্রেস অধিবেশনের লক্ষ্য।

তবে কি বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করতে করতেই কংগ্রেস অন্যরকম কিছু ভাবছে ? 'আর্থিক সংস্কারকে' সত্যিই 'মানবিক' করে তুলতে চাইছে? তাই কি দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করছে? সচেতন মানুষমাত্রেই জানেন, নয়ের দশকের গোড়াতেই কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে আর্থিক সংস্কার তথা বেসরকারীকরণ-উদারীকরণের যে নীতিতে সরকার চলতে শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তারও পরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার — সকলেই সেই নীতি অনুসরণ করেই দেশ চালিয়েছে। আজও কংগ্রেস সেই নীতি থেকে তিলমাত্র সরে আসেনি শুধু নয়, সিপিএম সহ সরকারি বামদলগুলি তাদের সমর্থন করায়, এই প্রশ্নে দেশের মানুষকে খানিকটা হলেও বিভ্রান্ত করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। আজ একথা স্পষ্ট যে, আর্থিক সংস্কারের এই নীতির সাথে জনগণের স্বার্থের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সংস্কার যত তীব্র হয়েছে, ততই তার কোপ এসে পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা-খনি-বন প্রভৃতি দেশের মূল্যবান সম্পদগুলি বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মুনাফা করার জন্য। কাজ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল পরিষেবা পুঁজির মালিকদের ব্যবসা করে মুনাফা লোটার পণ্যে পরিণত হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলি বিপন্ন হয়েছে। দেশিয় বাজারে ঢালাও বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনেও জনকল্যাণের যত রঙিন ছবিই আঁকা হোক না কেন, শেষ সিদ্ধান্তে আর্থিক সংস্কারকে জোরদার করার কথাই বলা হয়েছে। বিমা, পেনশন থেকে শুরু করে টেলিকম ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ, বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ, খুচরো বিক্রিতে বিদেশি লগ্নি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সংস্কারের জয়গান গাওয়া হয়েছে এবং তা চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন মঞ্চ থেকে উন্নয়নের যে মানবিক মুখের কথা বলা হয়েছে, তা যে আসলে মুখোশই, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখা গেল, একদিকে অধিবেশনে রেশনে ভরতুকি বজায় রাখার দাবি তোলা হচ্ছে, আর বাস্তবে তাদেরই পরিচালিত সরকার রেশনে চাল-গমের দাম বাড়াচ্ছে, বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। যেখানে অধিবেশনে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বাস্তবে শ্রমিক-কর্মচারীদের পি এফের সুদের হার সাড়ে নয় শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে আট শতাংশ করা হয়েছে, আরও কমাবার কথা চলছে। সংস্কারের নামে প্রচলিত শ্রম আইন বদলাবার যে চেষ্টা ইউ পি এ সরকার চালিয়ে যাচ্ছে তাতে যেমন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, আট ঘণ্টা কাজের সময়, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রভৃতি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তেমনই সামাজিক নিরাপত্তা তথা প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন প্রভৃতি সুযোগগুলিও কেড়ে নেওয়া হবে। অধিবেশনে এহেন শ্রমআইন সংস্কারের পক্ষেই জোরালো সওয়াল করা হয়েছে।

অধিবেশনে বিদেশ নীতির প্রশ্নে মার্কিন ঘনিষ্ঠতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপিএম সহ কংগ্রেসের সহযোগী বাম দলগুলির মার্কিন বিরোধিতা যে মেকি তা তাঁদের একদিকে মার্কিন পুঁজি সহ সবরকম পুঁজিকে রাজ্যে আবাহন, অপরদিকে কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়া নিরাপদে হতে দিয়ে, বাইরে নাম কা ওয়াস্তে বিরোধিতা করা থেকেই কংগ্রেসের ঝানু নেতাদের বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথাই নয়। তাই প্রতিরক্ষা সহ ভারত-মার্কিন নানা চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্তই অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা উভয়পক্ষ থেকেই ভারতীয় পুঁজিপতিদের জন্য সুবিধা আদায়ের রাস্তায় সরকার একদা চলেছে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সেই সুযোগ হারিয়ে ভারত এখন সরাসরি মার্কিন শিবিরেই যোগ দিচ্ছে।

ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে শুধু নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী আজ এতখানি শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে। এই স্বীকৃতি পেতে মার্কিন ঘনিষ্ঠতা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ববাজারের ভাগ পেতেও এই ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি সহায়ক হবে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই বাজারের স্বার্থকেই কংগ্রেস নেতারা 'জাতীয় স্বার্থ' বলে দেখাচ্ছেন। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইতিমধ্যেই জর্জ বুশের সাথে একাধিক বৈঠক

ছয়ের পাতায় দেখুন

জুট মিল শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্লাস এবং সাধারণ সভা

গত ২৬ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রাজনৈতিক ক্লাসের আয়োজন করা হয়। সংগঠন এবং ইউনিয়নের মিল ইউনিটগুলিকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, সংগঠক এবং কর্মীরা কীভাবে নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করে আরও বেশি দায়িত্ববান হতে পারেন, চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করে কীভাবে আন্দোলনকে গড়ে তোলা যায় এবং সঠিকপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় — এই ছিল রাজনৈতিক ক্লাসের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই ক্লাসের মুখ্য সঞ্চালক ছিলেন বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি, চটকল শ্রমিক আন্দোলনের বর্ষীয়ান শ্রমিকনেতা কমরেড সনৎ দত্ত। এছাড়া ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল উপস্থিত ছিলেন।

১৮টি জুটমিল থেকে ১৭০ জন শ্রমিক প্রতিনিধি এই ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি মিল ইউনিট থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে চটকল মালিকদের জুলুম আর অত্যাচারের কথা। চরম স্পর্ধায় একের পর এক শ্রম-আইনকে পায়ের তলায় পিষে দিয়ে ছাঁটাই, লক-আউট, পি এফ-গ্রাচুইটি-ই এস আই-এর টাকা আত্মসাৎ, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কন্ট্রাক্ট শ্রমিক নিয়োগ, মজুরি এবং ডিএ-র টাকা আত্মসাৎ এবং কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করা ইত্যাদি মালিকদের অসংখ্য বেআইনি কার্যকলাপের কথা প্রতিনিধিদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে। এইসব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলেই মালিকের পোষা গুণ্ডাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকারি দলের চোখ রাঙানি শুরু হয়। একটা সামান্য গেট মিটিং করতে গেলেও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতা-কর্মীদের পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়। শুধু তাই নয়, যাতে কোনও কার্যকরী আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য সিটু, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি ইত্যাদি ইউনিয়নগুলি মিলে সরাসরি ম্যানেজমেন্টের পক্ষ নিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর সামনে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলনের একমাত্র শক্তি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর যোগ্য ভূমিকা পালন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ রামজী সিং, মুর্তজা আলম, মানস ভট্টাচার্য, অযোধ্যা রাম, গোবিন্দ রায়, শেখ মইনুদ্দিন, ফাঁসি আহমেদ, রাজেশ সাউ, রাধেশ্যাম হরিজন, আব্দুল জব্বার, নিমাই দাস, আব্দুর রহমান প্রমুখ।

বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রাম সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে নিজেদের প্রথমে পরিবর্তন করতে হবে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা শ্রমিকদের চেতনার মান বাড়ানো এবং নিয়মিত স্টাডি ক্লাস করার কথা বলেন এবং পুনরুজ্জীবনের সংগ্রামে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে নিয়োজিত হবার আহ্বান জানান। কমরেড সদানন্দ বাগল অতীতের চটকল শ্রমিকদের গৌরবময় সংগ্রামের কথা তুলে ধরে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভার মুখ্য বক্তা কমরেড সনৎ দত্ত শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে তোলার উপর জোর দেন। এর জন্য তিনি প্রতিটি কারখানার মহল্লায় মহল্লায় শ্রমিক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংগঠকদের একটা গ্রুপ তৈরি করতে হবে যারা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর চিন্তাকে শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাবে। এর জন্য চাই উদ্যোগ এবং সার্বিক চেতনা। স্লোগান-মুখরিত সভা বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

অবিস্মরণীয় ২৭ জানুয়ারি

অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের মরণজয়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম

১৯৪১-এর ২২ জুন, রাত ৪টা। সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে ২২ মাস আগে সম্পাদিত ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি পূর্ব-আশঙ্কামতই পদদলিত করে হিটলারের ১৭০ ডিভিশন বিশাল ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দু-হাজার মাইল দীর্ঘ সোভিয়েত সীমান্ত জুড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বৃহত্তম রণক্ষেত্র। মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতপুষ্ট ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পুঁজিবাদী বিশ্ব মনে করত অপরাজেয়। ব্রিটেন বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপ তখন জার্মান বাহিনীর করতলগত। পরাজিত দেশগুলির সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জ্বালানি তেল, ইস্পাত-কয়লা-খাদ্য-কাঁচামাল সবকিছুই তারা যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছিল। এছাড়া তাদের সঙ্গে ছিল জোটের অন্তর্ভুক্ত ইতালি, হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ার বাহিনী। এই জোটবাহিনীকে সাহায্য করতে এসেছিল ফ্রান্স ও স্পেনের অভিযাত্রী ফ্যাসিস্ট দল। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমাজতন্ত্র ধ্বংসের কামনায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা সোভিয়েতের পতনের প্রহর গুণছিল। যুদ্ধের শুরুতে জার্মান বাহিনীও ঝটিকা আক্রমণ হেনে সোভিয়েতের অভ্যন্তরে বহুদূর ঢুকে যায় দৈনিক ৪০ মাইল গতিতে। তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চূর্ণ করে তারা এলাকার পর এলাকা দখল করে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। লিথুয়ানিয়া, রিয়ালিস্টক, মিনস্ক, লোও, ফিন উপসাগরের নার্ভা থেকে পিসকোভ ও পলোটস্ক, নীপার নদী হয়ে কৃষ্ণসাগরের খেরসন, ওদেসা বন্দর, উক্রাইনের কিয়েভ, স্মোলেনস্ক —মাস তিনেকের যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দখলে চলে যায়। কিন্তু তাদের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় একদিকে রাজধানী মস্কোতে এবং উত্তরে লেনিনগ্রাদে। পরবর্তীকালে স্ট্যালিনগ্রাদ যেমন হয়ে ওঠে সোভিয়েত প্রতিরক্ষার দক্ষিণের নোঙ্গর, তেমনি লেনিনগ্রাদ উত্তরের।

লেনিনগ্রাদ নগরীর গুরুত্ব

নগরী হিসেবে লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব অসাধারণ। সোভিয়েতের এটি দ্বিতীয় রাজধানী। পিটার দি গ্রেট-এর আমলে এর পত্তন। জলাভূমি ও 'শ্রমিকের হাড়ের' উপর এই শহর গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বড় বড় রুশ সম্রাট ও জারদের এটা ছিল রাজধানী ও বিলাস নিকেতন। আবার এই শহরেই রুশ বিপ্লবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আধুনিক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মের আরম্ভ এখানে। সোভিয়েত বিপ্লবের এবং মহান লেনিনের স্মৃতি বিজড়িত ও নামাঙ্কিত এই নগরীর মূল্য সোভিয়েত রাষ্ট্র তথা জনগণের কাছে অসাধারণ। শিল্প, বাণিজ্য, রেলপথ ও সমুদ্রপথের যোগাযোগের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ এবং গোলাগুলি যন্ত্রপাতি বস্ত্রশিল্প ও অস্ত্রসম্ভার নির্মাণের কেন্দ্র হিসেবে লেনিনগ্রাদ সোভিয়েতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে লেনিনগ্রাদে আছে মাকড়সার জালের মত বহু রেলপথের সংযোগ এবং এগুলির মধ্যে তিনটি রেলপথ প্রধান — পূর্বগামী ভলোগ্‌দা, দক্ষিণগামী মস্কো এবং উত্তরগামী মুর্মুনস্ক লাইন।

অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ

পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে জার্মান বাহিনী ঘিরে ধরল লেনিনগ্রাদকে। সেদিন ছিল ৮ সেপ্টেম্বর। এদিন থেকেই বাস্তবে শুরু হল লেনিনগ্রাদের ইতিহাসবিখ্যাত আড়াই বছরের বেশি অবরোধ যুদ্ধ। এই অবরোধ আরও গুরুতর হয়ে উঠল ফিনল্যান্ডের জন্য। জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণার পর ফিনল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। লেনিনগ্রাদের উত্তরে ফিনিশ সৈন্যেরা পুরানো ফিনল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেই আটকে গেল। তারা এবং জার্মান বাহিনী পরস্পর মিলিত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের মধ্যেকার ২৫০ মাইলের ব্যবধান কিছুতেই ঘুচতে দিল না লালফৌজ। কেননা, সেই অবস্থায় লেনিনগ্রাদ চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়ত এবং পূর্বদিকে লাডোগা হ্রদের জলপথ দিয়ে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের যে সামান্য যোগাযোগ ছিল তাও নষ্ট হয়ে যেত। এই সামান্য ফাঁকটুকু ছাড়া লেনিনগ্রাদ বাকি সোভিয়েত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, অবরুদ্ধ। বাল্টিক সাগরের নৌপথও বিপন্ন। কারণ, ফ্যাসিস্ট বাহিনী এই সমুদ্রের সমস্ত নৌঘাঁটি ও বন্দর অধিকার করে নিয়েছিল — একমাত্র ক্রোনস্টাডের নৌঘাঁটি ও দুর্গ ছাড়া। কিন্তু এই ঘাঁটি থেকেও সোভিয়েত নৌবহরের বেরোবার উপায় ছিল না। জার্মানরা এই দুর্গনগরী বেষ্টন করে শহরটিকে বিদীর্ণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। সুরক্ষিত শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণে জার্মানবাহিনীর দক্ষতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। লেনিনগ্রাদের আগে পর্যন্ত সারা ইউরোপে একটি দুর্গ কিংবা দুর্গায়িত অঞ্চলও জার্মানির কাছে অজেয় ছিল না। কিন্তু তারা আটকে গেল লেনিনগ্রাদ নগরীর প্রতিরোধের কাছে।

হিটলার ঘোষণা করলেন, যেকোন মূল্যে লেনিনগ্রাদ দখল কর। মার্শাল ফন্ লীব্ 'ফুয়েরারের' এই আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ চালালেন। তবু লেনিনগ্রাদ দখল তো দূরের কথা, তার উপকণ্ঠে বা শহরতলিতেও জার্মান বাহিনী পৌঁছতে পারেনি। সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান আক্রমণের শেষে নাৎসি লাইন দাঁড়াল লেনিনগ্রাদের কেন্দ্রস্থল থেকে সোজা পশ্চিমে ২৫ মাইল দূরে, পূর্বে লাডোগা হ্রদের তীরবর্তী স্লুশেলবুর্গ। তার মধ্যে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ। তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। লেনিনগ্রাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছিল কেবলমাত্র লাডোগা হ্রদের মাধ্যমে ও বিমানপথে। এতে প্রতিরক্ষার কাজ জটিল হয়ে পড়ে। কেননা, ঐ পথে সৈন্যদের ও শহরবাসীদের প্রয়োজনীয় সব কিছুর জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবু সেই অবস্থাতেই লালফৌজের স্থল ও বিমানবাহিনী তীব্র প্রতিরোধ রচনা করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ক্রোনস্টাডের নৌদুর্গ ও বাল্টিক সাগরের সোভিয়েত নৌবহর — যা কার্যত ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এর ফলে যুদ্ধজাহাজগুলো 'ভাসমান ব্যাটারির' রূপ ধারণ করে কামান থেকে অজস্র গোলা উদগীরণ করতে লাগল এবং নৌদুর্গের গোলন্দাজ ও নৌসেনারা পদাতিকের মত লেনিনগ্রাদ রক্ষায় যোগ দিল। জার্মান বাহিনী যেমন সর্বপ্রকার আঘাত হানবার জন্য অস্ত্রের সমাবেশ ও প্রয়োগ ঘটাতে লাগল, লালফৌজও তার পাল্টা জবাব দিতে লাগল।

লেনিনগ্রাদবাসীর নজিরবিহীন প্রতিরোধ

কেবল লালফৌজের ১০ লক্ষ সৈন্যই লেনিনগ্রাদ রক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল — তা নয়। জার্মানদের প্রবল আক্রমণের মুখে লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য সৈন্য ও নাগরিকদের উদ্দেশে যে মর্মস্পর্শী ও ঐকান্তিক আবেদন প্রচার করা হয়, তাতে সাড়া দিয়ে লেনিনগ্রাদের সর্বশ্রেণীর মানুষ — বিজ্ঞানী থেকে মজুর এবং অভিনেতা থেকে স্কুলের বালক-বালিকারা লেনিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ নাগরিক ৬০ লক্ষ বাহু নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রকৃত 'জনযুদ্ধে'র প্রথম ভূমিকা রচিত হয় সোভিয়েত বিপ্লবের পীঠস্থান এই নগরীতে। শহরের বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ ও জ্বালানি দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেছে। দু'বেলা সকলের ভরপেট রুটিও জুটছে না। এর উপর নামে শীত ও বরফের উৎপাত এবং মৃত্যু ও ব্যাধির বিভীষিকা। প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিল হাজার হাজার শহরবাসী। তার সঙ্গে জার্মান গোলা ও বোমার ধ্বংসলীলা তো আছেই। ৩০ লক্ষ লেনিনগ্রাদবাসী এবং উত্তর থেকে এসে আশ্রয় নেওয়া আরও কয়েক লক্ষ মানুষ প্রায় আড়াই বছর ধরে যে ভয়াবহ দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে, ইতিহাসে তারও কোন তুলনা নেই। ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার ভার্থ লিখছেন, "খাদ্য নেই, আলো নেই, আগুন নেই; এর উপর আবার জার্মান বিমান আক্রমণ এবং অনবরত গোলাবর্ষণ — ১৯৪১-৪২-এর শীতকালে লেনিনগ্রাদের নগর জীবন ছিল এমনই ভয়ঙ্কর।" মার্শাল ঝুকভ লিখেছেন, "কামান ও বিমান আক্রমণে লেনিনগ্রাদে নিহত হয়েছেন প্রায় ২১ হাজার মানুষ, কিন্তু অবরুদ্ধ শহরে অনাহারে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ লক্ষ ৪২ হাজার।" আনা লুই স্ট্রং লেখেন, "এই যুদ্ধে লেনিনগ্রাদকে আরও বেশি কষ্ট পেতে হয়েছিল, আড়াই বছর ধরে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় কামানের জ্বলন্ত গোলার মুখে থাকতে হয়েছিল। তার মধ্যে কিছুদিন সেখানকার লোক দৈনিক পাঁচ স্লাইস রুটি আর দু-গ্লাস জল খেয়ে কাটিয়েছে। তাই খেয়েই তারা যুদ্ধোপকরণ তৈরি করত, জার্মানদের সঙ্গে লড়াইও করত। জার্মানদের কামানের গোলায় যতজন মারা গেল, তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হল খাদ্যাভাবে।"

সোভিয়েত কৃষি বিজ্ঞানীরাও লেনিনগ্রাদের অবরুদ্ধ হয়ে না খেতে পেয়ে অনাহারে প্রাণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে দিল না পুটিন সরকার

২৭ জানুয়ারি ঐতিহাসিক লেনিনগ্রাদ যুদ্ধের শহীদ স্মরণে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিক-এর (এ ইউ সি পি বি) আহ্বানে রক্তপতাকা ও লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে মিছিল করে স্মরণবেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দ্বারা পুঁজিবাদী রাশিয়ার বর্তমান শাসকরা তাদের হিংস্র দাঁত-নখ বের করেছে শুধু নয়, তাদের ফ্যাসিস্টসুলভ চরিত্রও উদ্‌ঘাটিত করেছে।

১৯৪৪ সালের ২৭ জানুয়ারি দিনটির তাৎপর্য বিরাট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দীর্ঘ ৯০০ দিন ফ্যাসিস্ট হিটলারবাহিনীর নির্মম ও ভয়ঙ্কর অবরোধের মধ্যে খাদ্যহীন, পানীয় জলহীন অবস্থায়, নিরবচ্ছিন্ন বোমা ও গোলাবর্ষণের মধ্যেও আত্মসমর্পণ না করে লেনিনগ্রাদবাসীরা অসীম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে লেনিনের নামাঙ্কিত শহরকে রক্ষা করেছিল। হিটলার বাহিনী একা ছিল না, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ক্ষমতা হারানো রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা সংগঠিত সমাজতন্ত্রবিরোধী ভ্ল্যাসভ নেতৃত্বাধীন তথাকথিত 'রাশিয়ান লিবারেশন আর্মির' ৩৮ ব্যাটালিয়ন প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনী। ফ্যাসিস্টরা এই বাহিনীর নাম দিয়েছিল "ঝটিকাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা"। ২৭ জানুয়ারি মহান নেতা স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণ সেই অবরোধ ভেঙে ঐতিহাসিক বিজয় সূচিত করে।

২৭ জানুয়ারি প্রতি বছরই লেনিনগ্রাদবাসীরা পিস্কারিয়োস্কি সমাধিস্থলে সমবেত হয়ে শহীদদের স্মরণ করে। কিন্তু এবার স্মরণসৌধে সাদা-নীল-লাল ত্রিবর্ণ পতাকা দেখে নাগরিকরা দারুণ ক্ষুব্ধ হন, কারণ এই ত্রিবর্ণ পতাকা ফ্যাসিবাদের স্মারক। ত্রিবর্ণ পতাকা স্থাপন করা অনুমোদিত হলেও রক্তপতাকা নিয়ে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর প্রতিনিধিদের শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়ার অনুমতি দেয়নি পিটার্সবুর্গ (লেলিনগ্রাদ) প্রশাসন। এমনকী মিছিলের ছবি পর্যন্ত তুলতে দেওয়া হয়নি। অমর শহীদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে কেন লালফৌজের নিশান নিয়ে যাওয়া যাবে না প্রশাসন তা পরিষ্কার করে বলেনি, কিন্তু রক্তপতাকা ছিঁড়ে দেওয়া, কেড়ে নেওয়ার সাহস এখনো পায়নি। এ ইউ সি পি বি-র মতে অনুমতি না দেওয়ার দ্বারা প্রশাসন একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যদি রক্তপতাকা নিয়ে শহীদসৌধে মাল্যদান করতে হয় তবে তা বিনা অনুমতিতেই কর্তৃপক্ষের অগোচরে করতে হবে। তাই তাঁরা করেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্লান্ত সরকারি মিলিশিয়া চলে যাওয়ার পর তাঁরা মাল্যদান করেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করে স্মৃতিসৌধের সামনে জমায়েত বলশেভিকদের দমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিপুল সংখ্যক রক্ষীবাহিনী বলশেভিকদের ঘিরে ফেলে এবং এক্ষেত্রে সর্বদাই প্রশাসন যা করে, সেই মতো 'সত্য উদ্‌ঘাটনে'র জন্য তারা বলশেভিকদের পরিচয়পত্র যাচাই করে, রেজিস্ট্রেশন বৈধ কি না তাও জানতে চায় — যদিও সবই কর্তৃপক্ষের জানা।

সেদিন যাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন ১৯৪৪ সালের যুদ্ধের পশ্চাৎরক্ষীবাহিনীর কর্নেল আ.ই.দোব্রগরদস্কি সহ সম্মুখযুদ্ধের সৈনিকরা। রক্তপতাকার তলায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কর্নেল যেন তাঁর যৌবনে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি ও অন্যান্য বলশেভিকরা দীর্ঘ দু'ঘন্টারও বেশি এই পবিত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ অচঞ্চল প্রতিবাদ চলতে থাকায় শেষপর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী (মিলিশিয়া) ক্রমে ক্রমে সরে যায়।

মার্কিন ও ইজরায়েলি ফ্যাসিস্টদের অনুগত ক্রেমলিনের শাসকরা এবং প্রাদেশিক ক্ষমতাসীনেরা আজ যেকোন হীন, অপরাধমূলক কাজ করতে, এমনকী রক্ত ঝরাতেও পিছপা নয়। তারা কমিউনিস্ট আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে, সোভিয়েতের মানুষকে তাদের অতীতের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, অতীতের গৌরব ভুলিয়ে দিতে চায় যাতে তাঁদের মধ্যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষাকে মেরে দেওয়া যায়। এভাবেই তারা তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে চায়। প্রতি বছর দশ লক্ষ মানুষের জীবনাবসান ঘটে রাশিয়ায়। শাসকরা জানে, সরাসরি হত্যা না করলেও পুরনো দিনের সংগ্রামী মানুষেরা এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। তারা সেই অপেক্ষাতেই আছে।

বিশ্বাসঘাতক প্রতিক্রিয়াশীল ভ্ল্যাসভপন্থীদের উত্তরসূরিরা স্থানত্যাগ করার পর, অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিকের প্রতিনিধিরা দলীয় রক্তপতাকা নিয়ে দেশমাতৃকা মূর্তির বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন, বর্তমান শাসকদের শহীদবিরোধী কুৎসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেন এবং ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উত্তরসূরিদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে সামিল হতে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের কাছে আহ্বান জানান।

(সূত্র ঃ এ ইউ সি পি বি)

লেনিনগ্রাদে মরণজয়ী সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

দিয়েছেন। সোভিয়েত জনগণের জন্য সংরক্ষিত বীজভাণ্ডার থেকে বীজ খেয়ে কিছুদিন তাঁরা বাঁচতে পারতেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি। তাঁরা তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তবু জনগণের ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত শস্য স্পর্শ করেননি। এইরকম অপরিসীম লাঞ্ছনা, কষ্ট ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যেই নাগরিকরা লেনিনগ্রাদ রক্ষার সংগ্রাম চালিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র রক্ষায় জনগণের ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও একমুখী করে জনগণকে দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত করেছিল স্ট্যালিন নেতৃত্ব। তারা মহানগরীর চারদিকে ৩৪০ মাইল দীর্ঘ ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ফাঁদ, ১৫,৮৭৫ মাইল দৈর্ঘ্যের খোলা ট্রেঞ্চ, ৪০০ মাইল দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া, ১৯০ মাইল দীর্ঘ কাঠ ও গাছের গুঁড়ির বেড়া এবং ৫ হাজার পিলবক্স ও গুলিগোলা ছোঁড়ার ঘাঁটি তৈরি করে। অর্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা সেই অবস্থাতেই কারখানায় কারখানায় সমরাস্ত্র ও গোলাগুলির উৎপাদন বিরামহীন গতিতে চালিয়ে গেছে। বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা সাস্তাকোভিচ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে সান্ত্রীর কাজ করতেন; জার্মানরা আগুনে-বোমা নিক্ষেপ করলে তিনি সেগুলো বাড়ির ছাদ থেকে সরিয়ে দিতেন। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সপ্তম সিম্ফনি' রচনা করেন। সেটির বিষয়বস্তু — যুদ্ধ ও জয়।

ডিসেম্বর মাসে লালফৌজ মস্কো রণক্ষেত্রের পাশাপাশি লেনিনগ্রাদের দিকেও জার্মান বাহিনীর উপর আক্রমণ হানে, যাতে রাজধানী বেষ্টনকারী জার্মান অবরোধ ধ্বংস করা যায়। মাসের পর মাস লড়াই চলে। এই যুদ্ধে কোন চূড়ান্ত ফল না এলেও অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের এমন লাভ হয়েছিল যা লেনিনগ্রাদ রক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডিসেম্বর মাসের পাল্টা আক্রমণে লালফৌজ লেনিনগ্রাদ-ভলোগ্দা গামী রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন টিকভিন দখল করে নেয় এবং ভলকোভ্ অতিক্রম করে শ্লুশেলবুর্গের কয়েক মাইলের মধ্যে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণ তীরে পৌঁছায় এবং ফিনিশ ও জার্মান সৈন্যদের মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। এই হ্রদের পূর্বদিকে ওলোনেৎজ অঞ্চলেও জার্মান-ফিনিশ সৈন্যরা প্রতিহত হল। কেবল তাই নয়, লাডোগা হ্রদ যখন ঠাণ্ডায় জমে কঠিন হয়ে গেল তখন হ্রদের বরফের বুকের উপর দিয়ে ৬০ মাইল দীর্ঘ দু-সারি রেললাইন (double track) রুশরা স্থাপন করে। অবরুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত লেনিনগ্রাদের পূর্ব দিকে যেন একটা গবাক্ষপথের সৃষ্টি হল এবং তিন মাস ধরে এই রেলপথ যোগে মস্কো ও রাশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে সরবরাহ পৌঁছাতে লাগল। লেনিনগ্রাদের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কেবল খাদ্যই নয়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালপত্র যেমন সরবরাহ হল, তেমনই এখানকার বিশাল অস্ত্রের কারখানা থেকে উৎপাদিত সমর-সম্ভারও রাশিয়ার অন্যান্য অংশে প্রেরিত হতে লাগল। রেলপথের সঙ্গে দিবারাত্রি মোটরলরিও সরবরাহ যোগান দিতে লাগল। কিন্তু তাতেও বিপদ কম ছিল না। কঠিন বরফের স্তূপ মাঝে মাঝে ভেঙে প্রকাণ্ড গহ্বর হয়ে যেত। মাঝে মাঝে মোটরলরি সেই গহ্বর দিয়ে তুষার জলে তলিয়ে যেত। মাঝে মাঝে লরিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে যেত। কিন্তু এই সমস্ত বিপদের জন্য নিরস্ত হবার সময় রাশিয়ার ছিল না। বরফাস্তীর্ণ লাডোগা হ্রদের রেলপথ এই সময় শ্বাসরুদ্ধ লেনিনগ্রাদকে অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও শ্বাস নেবার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু শীত শেষে লেনিনগ্রাদ আবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৪২-এর নভেম্বরে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে যখন জার্মান বাহিনীকে লালফৌজ বিপন্ন করে তোলে, তখন যুদ্ধের রাশ চলে আসে লালফৌজের হাতে। স্ট্যালিনের আদর্শবাদী, জনপ্রিয়, যোগ্য নেতৃত্ব এবং শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কল্যাণে যুদ্ধের শুরু থেকেই ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও সোভিয়েত অর্থনীতি এগোতে থাকে। জ্বালানি, রসদ ও অস্ত্রসম্ভারের উৎপাদন বাড়তে ও উন্নত হতে থাকে। অন্যদিকে আপাতবিজয়ের তলায় পুঁজিবাদী জার্মানির অর্থনীতি ধসে পড়া শুরু হয়। ভাড়াটে ফ্যাসিস্ট সেনাদের মনোবল ভাঙতে থাকে। পাল্টা ভয়াবহ আক্রমণের সামনে পিছু হটতে থাকে নাৎসি বাহিনী। তখন উত্তরে লেনিনগ্রাদ এলাকায়ও লালফৌজ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ১৬ মাস ধরে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্লুশেলবুর্গ দুর্গের পূর্বদিকের জার্মান অবরোধ ধ্বংস করে লালফৌজ একটি পথ মুক্ত করে। কিন্তু অবরোধ সম্পূর্ণ মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এই অবরোধ মুক্ত হতে আরও একটি বছর লেগে যায়। ১৯৪৪ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রায় আড়াই বছর ধরে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ জার্মান অবরোধ থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ করে। এমন ভয়ঙ্কর অবরোধ এবং তার বিরুদ্ধে ৯০০ দিন ও রাত মিলে এমন শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই ইতিহাসে অতি বিরল দৃষ্টান্ত। সেকারণে ২৭ জানুয়ারি অবরোধ-মুক্তির দিনটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসংহারে সাংবাদিক বিক্রমন নায়ারের 'দুই ইউরোপের দিনলিপি' গ্রন্থের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। স্ট্যালিনের সমালোচক এই সাংবাদিক লেনিনগ্রাদ প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষ মুহূর্তের এই ঘটনাটি লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, লেনিনগ্রাদ প্রতিরোধ ভাঙতে ব্যর্থ সেনানায়কদের প্রতি হিটলার তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর সেনাধ্যক্ষদের ডেকে তীব্র তিরস্কার করছেন, এমনকী গালাগালও দিচ্ছেন। বলছেন, জার্মানি অপরাজেয়, ১১ দিনে শেষ হয়েছে মহান ফ্রান্সের উপর দিয়ে নাৎসি অভিযান। অথচ এই বলশেভিক ছোটলোকদের এক একটি গ্রাম দখল করতে লাগছে মাসাধিক কাল, ৯০০ দিনেও পারা যাচ্ছে না লেনিনগ্রাদে ঢুকতে। আশ্চর্য! গুডারিয়ান, ফন রুণ্ডস্টণ্ড্, রোমেল সহ বড় বড় জেনারেলরা চুপ। জেনারেল মোডেল বৃদ্ধ, তার উপর নির্জলা নাৎসি। তাই তাঁর সাহস বেশি। তিনি বলে ওঠেন, ঃ 'হাইল হিটলার, শুনুন। আমি ফুয়েরারকে পরিষ্কার জানাতে চাই, রাশিয়াকে জয় করা যাবে না।' সবাই তটস্থ। হিটলার সোজা গ্যাস-চেম্বারে পাঠাবেন মোডেলকে। হিটলার কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করেন, মোডেল, তুমি কেন এ কথা বলছ? মোডেল বলেন, এর উত্তরে আমি একটি গল্প বলছি, গল্প কিন্তু বাস্তব ঘটনাকে নিয়েই। মিনস্ক শহরের ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের পর রুশ প্রতি-আক্রমণ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আমরা শহরের বাইরে বনভূমিতে আস্তানা গাড়ি। তারপর দু-সপ্তাহ ধরে দেখলাম পার্টিজানদের গুলি ও গ্রেনেড আক্রমণের বিরাম নেই। আমরা স্থান পরিবর্তন করে যেখানেই তাঁবু ফেলি, ঠিক সেই স্থানেই এসে পড়ছে কামানের গোলা ও গ্রেনেড। ব্যাপার কী? ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের ১৪ দিনের মাথায় আমাদের ক্যাম্পের ঠাকুর রান্নার কাঠ কাটতে উঠেছিল এক বিধ্বস্ত রুশ ট্যাঙ্কের উপর। ট্যাঙ্কের ফাটল দিয়ে সে বুঝি উঁকি মেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিয়ে আমাদের খবর দিল যে, ট্যাঙ্কের মধ্যে এখনও মানুষ আছে। আমরা সব ছুটে গেলাম সেই দিকে। উঁকি মেরে দেখলাম, মৃত সঙ্গীর পচা-গলা মড়ার ওপর হাত-পা কাটা অবস্থায় এক রুশ শুয়ে আছে। ওর মাথার কাছে রেডিয়ো কিন্তু অক্ষত। ১৪ দিন সে শুয়ে আছে মৃত সঙ্গীর দেহের উপর, রক্তক্ষরণে অবশ শরীর, খাওয়া নেই, কিন্তু ট্যাঙ্কের ফাটল দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে সে রেডিয়ো মারফত পার্টিজানদের এতদিন ধরে ঠিক ঠিক খবর দিয়ে যাচ্ছে। ফুয়েরার, এঁরা সাব-হিউমান নয়, ইন-হিউম্যান। এরা মানুষ নয়। এদের সঙ্গে আমরা মানুষ, পেরে উঠব না। আপনি অনুমতি দিন রুশ অভিযান বন্ধের। হিটলারের পাগলামি তখন মুখ-চোখ দিয়ে ফুটে বেরোল, মোডেলকে বললেন — "চুপ! ..." তার কয়েকদিন পরেই এই নাৎসি জেনারেল পিস্তলের নল নিজের কানে ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপে দেন এবং অমানুষদের সঙ্গে অসম লড়াই থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দেন।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে — জেনারেল মোডেল ঠিকই বুঝেছিলেন; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় এবং মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাদবাসী তথা সোভিয়েত বিপ্লবীরা এক অন্য জাতের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। হিটলার ও তার ফ্যাসিস্টবাহিনীর সাধ্য কী — তাকে পরাভূত করে।

[সূত্র ঃ (১) রুশ-জার্মান সংগ্রাম, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভিক্তর মাৎসুলেনকো (৩) স্তালিন যুগ, আনা লুই স্ট্রং (৪) রাশিয়া অ্যাট ওয়ার, আলেকজান্ডার ভার্থ (৫) দুই ইউরোপের দিনলিপি, বিক্রমন নায়ার।]

পুঁজির স্বার্থে নীতি নির্ধারণই মূল লক্ষ্য

চারের পাতার পর

করেছেন ; সম্প্রতি ওয়াশিংটনে গিয়ে পরমাণু জ্বালানি আমদানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আমেরিকায় গিয়ে সামরিক চুক্তিও করেছেন। আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থায় ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এই প্রশ্নে সরকারের বিরুদ্ধে সিপিএম নেতাদের হুমকি ফাঁপা বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। মার্চ মাসের গোড়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ভারত সফরে আসছেন। সেখানেও ভারত-মার্কিন পুঁজিপতিশ্রেণীর মিত্রতা আরও গভীর হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফরে সিপিএম বিরোধিতার হুমকি দিলে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের তা 'কলাইকুণ্ডা স্টাইলে' করার অর্থাৎ লোক দেখানো প্রদর্শনীর মত করবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সমস্ত দিক থেকেই কংগ্রেস অধিবেশন ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার অগ্রগতির স্বার্থে নীতি নির্ধারণের মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তও সেই অনুযায়ীই হয়েছে। আর দেশের একশ কোটি সাধারণ মানুষ ? তাদের জন্য জমিদার বাড়ির উঠোনে কাঙালিভোজনের মত বরাদ্দ রইল অন্নপূর্ণা যোজনা আর গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে পরিবার পিছু ১ জনের ১০০ দিনের কাজ। ১০০ দিনের কাজের এই সিদ্ধান্তটুকু নিতেও সরকারের প্রায় দু'বছর কেটে গেল। দেশের গরিব মানুষ জানে না, এই ক'টা দিনের কাজও শেষপর্যন্ত কবে তাদের হাতে এসে জুটবে। আর যদি কোনদিন জোটেও, বছরের বাকি ২৬৫ দিন তাদের চলবে কী করে — তার কোন উচ্চবাচ্য অধিবেশনের মঞ্চ থেকে করা হয়নি। বোধহয় নেতারা ভেবে নিয়েছেন, সেই দিনগুলিতে অনাহারি পেটে বাঁধার জন্য পরনের গামছাটুকু তো এখনও রয়েছে।

নেতাজী জন্মদিবস পালন

শিলিগুড়ি

২৩ জানুয়ারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিভূ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১১০তম জন্মদিবসে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে শিলিগুড়ির হাতিয়াডাঙ্গা স্কুলে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলোচনা করেন ডি এস ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয় লোধ, ডি ওয়াই ও-র কমরেড প্রদীপ দাস।

এছাড়া ২৪ জানুয়ারি খড়িবাড়ীতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্থানীয় শিক্ষক কুমুদ সিং এবং কমরেড জয় লোধ।

দার্জিলিং

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে নেতাজী জন্মদিবসে শিলিগুড়ির একটিয়াশাল হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা পলি রায়, সুজিত ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রদীপ দাস।

২৫ জানুয়ারি বাতাসীর অধিকারী নিবেদিতা স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিষ সিন্‌হা, জয় লোধ, অবধেশ ভক্ত ও কৌশিক দত্ত।

অ্যাবেকার কোচবিহার জেলা সম্মেলন

কোচবিহার শহরে অবস্থিত পঞ্চশহীদ মঞ্চে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ২৯ জানুয়ারি তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার সদর এই ৫টি মহকুমা থেকে তিন শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক এসেছিলেন এই সম্মেলনে। এদের মধ্যে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যাই বেশি। প্রকাশ্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সমীর গুহমজুমদার। প্রধানবক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি।

প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন সমীর গুহমজুমদার, অবনীভূষণ রায় ও সত্যেন ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আবদুর রউফ আমেদ, আয়ব্যয় ও মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যথাক্রমে গৌতম চন্দ ও কাজল চক্রবর্তী। মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে সমীর গুহমজুমদারকে সভাপতি, কাজল চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি ওয়ার্কার্স সম্মেলন

২৬ জানুয়ারি অরঙ্গাবাদে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড আব্দুল খালেক। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এস ইউ সি আই-এর সুতী লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড সুবোধ কুমার দাস। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ অশোক দাস ও আব্দুস সঈদ। ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২০ জনকে নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি ওয়াকার্স ইউনিয়নের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কমরেড আব্দুস সঈদ এবং যুগ্মসম্পাদক হিসাবে কমরেডস আব্দুল খালেক ও শিশির সিংহ নির্বাচিত হয়েছেন।

বিমানবন্দরকর্মীদের ধর্মঘট

একের পাতার পর

প্রতিরোধ আন্দোলন, নয় ছাঁটাই — এই অবস্থার সামনে পড়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা সরকারের সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে আন্দোলনে অবিচল ছিলেন। এই আন্দোলনকে সি পি এম-সি পি আই নেতৃত্ব নিছক 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন' বলে বর্ণনা করে এই আন্দোলনের গুরুত্বকে শুধু খাটো করেছে তাই নয়, নিজেরা রাজনৈতিকভাবে বেসরকারীকরণের বিরোধিতা করার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। এই আন্দোলনকে ঘিরে সংবাদমাধ্যমে যে লাগাতার অপপ্রচার চালানো হয়েছে, দলীয় স্তরে রাজনৈতিকভাবে তারও জবাব দিয়ে বিভ্রান্তি কাটানোর কোনও চেষ্টাই তারা করেনি। শুরু থেকেই সি পি এম-সি পি আই ছিল আন্দোলনের প্রশ্নে আপসমুখী। সংবাদে প্রকাশ, বিমানকর্মীদের আন্দোলন কর্মবিরতি দিয়ে শুরু হোক, সি পি এম-সি পি আই নেতৃত্ব তা চাননি। আন্দোলন বিক্ষোভ-ডেপুটেশনের স্তরেই থাকুক এমনটাই তাঁরা চাইছিলেন। সেই কারণেই শুরু থেকে তাঁরা কোনও প্রতিবাদই করেননি। আধুনিকীকরণের তোড়জোড় চলছে অনেকদিন ধরেই। টেন্ডারও ডাকা হয়েছে প্রকাশ্যেই। সিপিএম নেতারা বেসরকারীকরণের বিরোধী হলে তখনই তাদের আপত্তি তোলার কথা ছিল। কিছুই না করে টেন্ডারপত্র সরকার খোলার পর যেন তাঁদের ঘুম ভাঙল। এমনকী তখনও তাঁরা সরকার থেকে সমর্থন তোলার কথা বললেন না, উল্টে বিমানকর্মীদের আন্দোলনকে 'ট্রেড ইউনিয়ন ইস্যু' বলে দেখিয়ে হাল্কা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু সাধারণ কর্মচারীরা নিজেরাই নেমে গিয়েছিলেন কর্মবিরতি আন্দোলনে। আন্দোলনের প্রশ্নে সি পি এম-সি পি আই নেতৃত্বের এই ভূমিকার কারণ বোঝা দুর্বোধ্য নয়। তাঁরা এখন মালিকশ্রেণীর বন্ধু। পাছে আন্দোলন তীব্র রূপ নিলে বণিকসভা ক্ষিপ্ত হয়, এই ভয়ে আন্দোলনের এই লাগাম টানা। একদিকে কর্মচারীদের আন্দোলনমুখী মানসিকতা দেখে তাঁদের হাতে রাখার জন্য আন্দোলনে যেমন তাঁদের যেতে হয়েছে, তেমনি বণিকদের সংগঠন ফিকির সভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই আন্দোলনের জন্য নির্লজ্জের মতো দুঃখপ্রকাশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আসল মর্মার্থ।

বিমানকর্মীদের আন্দোলনে সি পি এম-সি পি আই নেতৃত্বের এই বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দেয় শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে এরা অক্ষম। সি পি এম-সি পি আই যদি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হত তাহলে শ্রমিক-কর্মচারীদের এই আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখত, রাষ্ট্রের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকা উদঘাটিত করে দেখাতো এবং অন্যান্য অংশের শ্রমিককর্মচারীদেরও এই আন্দোলনের সমর্থনে সামিল করত। সে'সব তারা করেনি। এমনকী বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানিতে রেল, বিমান সহ নানা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে যে জোরদার আন্দোলনের খবর গণশক্তি প্রায়ই ছেপেছে, সি পি এম নেতৃত্ব বিমানকর্মী আন্দোলনকে ততটাও জোরালো হতে দেয়নি। তার আগেই তারা পিছন থেকে ছুরি মেরে আন্দোলনকে খতম করেছে। বিশ্বের অন্যত্র সরকারবিরোধী দলগুলি ভোটের স্বার্থে যতটা শ্রমিকস্বার্থে দরকষাকষি করেছে এরা তাও করেনি। এজন্যই লেনিন বলেছিলেন, মেকি বামপন্থীরা যখন বুর্জোয়াদের স্বার্থ দেখে তখন বুর্জোয়াদের চেয়েও ভালভাবে দেখে।

তাছাড়া এই প্রশ্নের জবাব তো সি পি এম-সি পি আই নেতৃত্বকে দিতে হবে যে, তাদের সমর্থনে টিকে থাকা ইউ পি এ সরকার বেসরকারীকরণের এই সিদ্ধান্ত নিতে পারল কী করে ? সেখানে তারা প্রতিবাদ করেননি কেন ? পার্লামেন্টে বিতর্কের ঝড় তোলেননি কেন ? এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেননি কেন ? এবং সর্বোপরি, স্বীকৃত ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেননি কেন ? শুধু বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ নয়, ইউ পি এ সরকারের মাত্র ১৯ মাসের শাসনে এত জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, তা পূর্বেকার সরকারের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৯ মাসে ৫ বার পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমানো, কালা পেটেন্ট বিল পাশ করানো, কোর শিল্পের বেসরকারীকরণ, জনবিরোধী রেলবাজেট-কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়ন, ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো এবং নয়া পেনশন বিলের যে রূপরেখা তৈরি করেছে ইউ পি এ সরকার তা কর্মচারীদের জীবনে এক ভয়াবহ আঘাত। রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির খড়্গও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইউ পি এ সবচেয়ে নির্লজ্জ ভূমিকা নিয়েছে বিদেশনীতির প্রশ্নে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ক্রমশ যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, যা এদেশের গণআন্দোলন ও জনস্বার্থের পক্ষে মারাত্মকভাবে বিপজ্জনক। সি পি এম-এর সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে কংগ্রেস যেভাবে একের পর এক জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সি পি এম নেতৃত্ব কি তার দায় এড়াতে পারে ? এখন তারা — 'সমন্বয় বৈঠকে যোগ দেব না', 'সার্বিক সমর্থন নয়, ইস্যুভিত্তিক সমর্থন' ইত্যাদি বুলির মধ্য দিয়ে ভোটের স্বার্থে লড়াকু ভান দেখাচ্ছে, আবার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ক্ষমতার স্বাদও ভোগ করতে চাইছে। তাদের এই ক্ষমতালোভ এত তীব্র যে সেজন্য যদি শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও তারা পিছপা নয়।

সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের একথা বুঝতে হবে যে, এই বেসরকারীকরণ কোনও একটা সরকারের মর্জিমাফিক কোনও সিদ্ধান্ত নয় ; সঙ্কুচিত পুঁজিবাদী বাজারে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার জায়গা করে দিতে রাষ্ট্র পরিচালিত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। বিশ্বের সর্বত্র এই আক্রমণ চলছে, চলছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিরোধ সংগ্রামও। এই লড়াইয়ে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হল, যে পুঁজিবাদী সরকারগুলি এই বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণের কারিগর এবং সি পি এম-সি পি আই-এর মতো যে লাল ঝাণ্ডাধারী দলগুলি বামপন্থার কথা বলতে বলতেই বেসরকারীকরণ করছে — সেই সরকারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে বেসরকারীকরণ রোখা যাবে না। বিমানবন্দর কর্মীদের এই আন্দোলনের নেতৃত্বে একটা প্রভাবশালী অংশ হিসাবে সি পি এম-সি পি আই-এর শ্রমিক সংগঠনের নেতারা থাকায় এবং এই আন্দোলনে কোনও সংগ্রামী নেতৃত্ব, এমনকী শ্রমিকদরদী মানবিক নেতৃত্ব না থাকায় আন্দোলন কর্মচারীদের লড়াকু মানসিকতা সত্ত্বেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না, মাঝপথে মার খেয়ে গেল। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল যে, আজকের শ্রমিক আন্দোলনের, গণ আন্দোলনের সামনে থেকে আপসকামী, দোদুল্যমান, দ্বিচারিতাসম্পন্ন নেতৃত্বকে সরিয়ে সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা শ্রমিকশ্রেণীর সামনে কত জরুরি।

বিমানবন্দর কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

বিমানবন্দরের কর্মচারী ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রেসিডেন্ট কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

''আধুনিকীকরণের অজুহাতে দিল্লি ও মুম্বাই বন্দর বেসরকারীকরণের কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধর্মঘটী বিমানবন্দর কর্মচারীদের প্রতি আমরা সুদৃঢ় সংহতি জানাচ্ছি। এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য দেশের শ্রমজীবী জনগণকেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা পরিষ্কারভাবে মনে করি, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান পরিবহন ব্যবস্থার সর্বাত্মক বেসরকারীকরণের যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি কেন্দ্রের সরকারগুলি দীর্ঘকাল ধরেই নিয়ে রেখেছে, বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে ২টি বিমানবন্দর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা সেই সর্বাত্মক বেসরকারীকরণের দিকেই নিশ্চিত পদক্ষেপ। আমরা একথাও মনে করি যে, বিমান পরিষেবার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক এই ক্ষেত্রটির বেসরকারীকরণ জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ও জনস্বার্থের পরিপন্থী। ধর্মঘটী বিমানবন্দর কর্মচারীদের প্রতি আমাদের আবেদন — যতক্ষণ না সরকার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে এবং বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা বরবারের জন্য পরিত্যাগ করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, ততক্ষণ কর্মচারীরা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখুন।''

দার্জিলিঙে বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে শ্রমিক অবস্থান

অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চা-বাগান খোলা, বন্ধ চা-বাগানের লিজ বাতিল করে সরকারি অধিগ্রহণ, সপ্তাহে ৬ দিন খাটিয়ে ৩ দিনের মজুরি দেওয়া বন্ধ করা, পি এফ-এর টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের শাস্তি, বিনামূল্যে রেশন, চিকিৎসা ও শিক্ষা এবং সিঙ্কোনা বাগিচার বেসরকারীকরণের চক্রান্ত ব্যর্থ করার দাবিতে গত ২৭ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী গণ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর ভাষণে চা-বাগিচা শিল্পের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির জন্য মালিকদের দায়ী করেন। যেভাবে একের পর এক মালিকরা সমস্ত আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাগান বন্ধ করে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং বাগানগুলিতে যেভাবে সিটু, আই এন টি ইউ সি মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কমরেডস্ তপন ভৌমিক, শঙ্কর পাল, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক রবি ঘোষ, দেবাশিস শর্মা, হরিশঙ্কর বর্মন এবং শঙ্কর গাঙ্গুলি।

গণ অবস্থান চলাকালীন জয়েন্ট লেবার কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বন্ধ চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা রুজু করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো করা হবে এবং তিনি দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ দিলীপ ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, রাজু কারকেট্টা সহ অন্যান্য শ্রমিকরা। এ ডি এম-এর নিকটও দাবিপত্র পেশ করা হয়।

ভাটিখানায় হানা দিয়ে মহিলারা মদের ড্রাম পৌঁছে দিল পুরুলিয়া জেলাশাসকের দপ্তরে

গত ৫ মাস ধরে পুরুলিয়া শহরের কাটিনপাড়ায় মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবিতে এলাকার মা-বোনেরা আবেদন-নিবেদন-ডেপুটেশন-অবস্থান সবই করেছেন, কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসন কোন তরফ থেকেই শুষ্ক আশ্বাসবাণী শোনানো ছাড়া কার্যত কিছু করা হয়নি। এই অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে মহিলারা গত ১৫ জানুয়ারি ভাটিখানায় হানা দিয়ে মদের ড্রাম এবং বোতলগুলি ট্রাকে তুলে পুরুলিয়া থানায় জমা দিতে যান। কিন্তু থানা সেগুলি নিতে অস্বীকার করে। তখন মহিলারা সেগুলি আবগারি দপ্তরে পৌঁছে দিতে যান। সেদিন ছুটি থাকায় দপ্তরে কোন কর্মচারী ছিলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে মহিলারা প্রবল শীত উপেক্ষা করে আবগারি দপ্তরের সামনে সারারাত মালপত্র পাহারা দেন। পুলিশকে বারবার বলা সত্ত্বেও মহিলাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। পুলিশের এই ভূমিকাকে শহরের মানুষ ধিক্কার জানান।

পরদিন ১৬ জানুয়ারি আবগারি দপ্তরও মদের ড্রাম ও বোতলগুলি জমা নিতে অস্বীকার করে। বিস্মিত হন মহিলারা। তবে কি মদ ব্যবসায়ী- থানা-পুলিশ-আবগারি দপ্তর চক্র এর পিছনে কাজ করছে — প্রশ্ন দেখা দেয় তাঁদের মধ্যে। এই অবস্থায় মহিলারা জেলাশাসকের দপ্তরে যান এবং মদের ড্রাম ও বোতলগুলি জমা নিতে বাধ্য করেন। আন্দোলনের প্রতিটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মহিলা সাস্কৃতিক সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ।

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিচ্ছে। মদের ব্যাপক লাইসেন্স দেওয়ার পিছনে রাজস্ব ঘাটতির কথা বলা হলেও এর পিছনে রয়েছে মানুষকে, বিশেষত যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ত করে দেওয়ার দুরভিসন্ধি। জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান এবং আন্দোলনের পথ থেকে মানুষকে দূরে রাখতেই পুঁজিবাদী সভ্যতা মদ-জুয়া-অনলাইন লটারি-অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় পরিচালিত গণসংগঠনগুলি — এ আই এম এম এস, এ আই ডি ওয়াই ও প্রভৃতি। প্রয়োজন এই আন্দোলনকে তীব্রতর করা, বিস্তৃত করা এবং পচা-গলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির উৎসমূল উৎপাটন করা।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চ

গত ৩১ জানুয়ারি ''জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চে''র ডাকে দশ সহস্রাধিক মানুষ কলকাতায় এসেছিলেন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৩ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিতে। জয়নগরের ১৫টি অঞ্চল এবং পৌরসভার ১ লক্ষ ৩ হাজার ৭৯০ জন মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত এই দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে দেন বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চের আহ্বায়ক প্রবীর বৈদ্য সহ অজয় সাহা, সুজাতা ব্যানার্জী ও সহদেব কয়াল প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল।

গ্রাম বাংলার উন্নয়নের সরকারি ঢক্কানিনাদের আড়ালে বাস্তবে গ্রামীণ জনগণ কী শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তারই দাবি তুলে ধরে, জয়নগরের মানুষ তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলেছে 'জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চ'। জয়নগর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানই শুধু নয়, বহু রক্তক্ষয়ী চাষী আন্দোলন ও গণআন্দোলনের ঐতিহ্যে মণ্ডিত। এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকেই জয়নগরের মানুষ বিধানসভা নির্বাচনে গণআন্দোলনের শক্তি এস ইউ সি আই প্রার্থীদের দীর্ঘকাল ধরে যেমন জয়ী করে আসছে, তেমনই এই উপলব্ধিও তাদের আছে যে, সংগঠিত গণআন্দোলন ছাড়া জনগণের ন্যায্য দাবি আদায় করা যাবে না। এজন্যই দলমতনির্বিশেষে জনগণের আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চের সৃষ্টি, যার পাশে রয়েছেন এই কেন্দ্রের বিধায়ক, বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

৩১ জানুয়ারি জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চের ডেপুটেশন। (ইনসেটে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দেওয়া স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়ন ঘটলেও আজও চাষের জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীমাতৃক। এখানে মাত্র কয়েক কোটি টাকা খরচ করলেই সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করা যায়, কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু সরকার উদাসীন, উদাসীন কৃষিদপ্তর, সেচদপ্তর; এনিয়ে তাদের কোন সুসংহত পরিকল্পনাই নেই। সুন্দরবন অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর। একদিকে কৃষি উপকরণের দাম দেশিবিদেশি কোম্পানিগুলো লাগামহীনভাবে বাড়িয়ে চলেছে, অন্যদিকে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর ন্যায্য দামে কৃষকের ফসল কেনার ব্যবস্থা না করায় ফড়েদের চক্রান্তের জালে পড়ে কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছে। কৃষকের ফসল সংরক্ষণের জন্য বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলে আজও কোন হিমঘর সরকার গড়ে তোলেনি। সরকার সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিকদের হাতে কৃষিজমি তুলে দিয়ে তাদের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেবার চক্রান্তে ব্যস্ত।

জয়নগরের উন্নয়ন বলতে জয়নগরের মানুষের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নকেই বোঝায়। দুটি ক্ষেত্রেই ভয়াবহ আঘাত নামিয়ে আনা হয়েছে। সিপিএম ফ্রন্টের মাধ্যমে এ রাজ্যে যে পুঁজিবাদী অবামপন্থী শাসন চলছে তারই পরিণামে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অন্যদিকে মদ-জুয়া-অনলাইন লটারি প্রভৃতির মাধ্যমে এবং সুন্দরবনে ট্যুরিজমের নামে সাংস্কৃতিক মানের অবনমন ঘটানোর সর্বাত্মক আয়োজন চলছে।

দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় যেমন কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি, তেমনি সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও এলাকার শিল্পোন্নয়নে গুরুত্ব দেয়নি। নদীনালা ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষ, বরফ কল, দূষণমুক্ত জলযান চালু ও সর্বোপরি অসংখ্য জলাধার নির্মাণ এবং খাল খনন করে এলাকার কয়েক লক্ষ বিঘা জমিকে দু'ফসলি, তিনফসলি করে সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা যেত, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যেত। কিন্তু এদিকে সরকারের নজর নেই। সরকার এখন শিল্পায়নের এবং কর্মসংস্থানের অজুহাত তুলে কৃষকদের জমিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দারিদ্র্যপীড়িত এই জেলার হাজার হাজার পরিবারের দিন কাটে অর্ধাহারে, কষ্টের মধ্য দিয়ে। অনেকেরই রেশন কার্ড নেই। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষগুলিকে বিপিএল কার্ড দেওয়া নিয়ে চলছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। শুধু তাই নয়, এখানকার মানুষ অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় যোজনার সরকারি পাওনা থেকেও বহুক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এই দুই যোজনায় নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়েও নির্লজ্জ দলবাজি চলছে। জেলার অসহায়, দারিদ্রপীড়িত মানুষগুলির ওপর সরকার নতুন করে পঞ্চায়েতী করের বোঝা চাপাচ্ছে।

এলাকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল খুব খারাপ। হাসপাতালে ডাক্তার থাকে না, চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম-ওষুধ মেলে না। বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকে রোগীরা। এদের বেশিরভাগই হতদরিদ্র। এই মানুষগুলির পক্ষে অন্য বড় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানোও সম্ভব নয়।

পরিবহনের অবস্থা ভয়াবহ। গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের কোন সরকারি পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল, প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। রেল পরিষেবাও অত্যন্ত নিম্নমানের। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত ডবল লাইন এখনও স্থাপিত হল না। কলেজের অভাব পূরণ করার প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি।

এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সুস্থিতি বিপন্ন করে সুন্দরবনকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলে ধনীর দুলালদের স্ফূর্তির জন্য নদীবক্ষে 'ফ্লোটেল' নির্মাণের পরিকল্পনায় সরকার বুঁদ হয়ে আছে। বহমান নদী অন্যায়ভাবে বেঁধে দিয়ে মাছের ভেড়ি বানানোর ব্যাপারে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ।

জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে দফায় দফায় পরিবহন মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী সহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে দাবি পেশ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ জানুয়ারি জয়নগর বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা ও পনেরটি অঞ্চল থেকে প্রায় দশ হাজার মানুষ কলকাতায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি জানাতে।

৩১ জানুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হয়ে সংগ্রামী মানুষের এক সুসজ্জিত মিছিল মহাকরণ অভিমুখে যাত্রা করে। পুলিশ রানি রাসমণি রোডে মিছিলের গতিরোধ করলে জনতা রাস্তার ওপর বসে পড়ে। চলতে থাকে প্রতিবাদ সভা। সেখান থেকে বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি নিয়ে মহাকরণে যান। স্মারকলিপিতে সরকারের কাছে যে সমস্ত দাবি জানানো হয়েছে, সেগুলি হল — অবিলম্বে সকলকে রেশন কার্ড দিতে হবে; প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ, বেহাল রাস্তাগুলির সংস্কার এবং হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সমস্ত রকম চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম ও ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে; সেচের ব্যবস্থা করতে হবে; চাষের জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না; পঞ্চায়েতী কর চাপানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে; লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত রেলের ডবল লাইন এবং জয়নগরে মহিলা কলেজ স্থাপন করতে হবে; হিমঘরের ব্যবস্থা করতে হবে, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ গ্রামীণ মজুরদের জীবনের মান উন্নয়ন করতে হবে প্রভৃতি।

আলোচনা শেষে ফিরে এসে প্রতিনিধিদল উপস্থিত জনতাকে জানান, পরিবহণমন্ত্রী অবিলম্বে জয়নগর-কলকাতা বাস পরিষেবা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; জায়গা পাওয়া গেলে জয়নগরে একটি বাস টার্মিনাস গড়ে তোলা হবে বলে তিনি কথা দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেশন কার্ড বিলি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে অবিলম্বে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্তমন্ত্রীও এলাকার প্রধান সড়কটি মেরামতের নির্দেশ দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হলে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েছেন 'জয়নগর উন্নয়ন মঞ্চ -এর সংগ্রামী মানুষ।

ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনই কর্মচারীদের একমাত্র দাবি নয়

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের (জেপিএ) সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা প্রধানমন্ত্রীর ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা সম্পর্কে ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

''অত্যধিক বিলম্বিত এই ঘোষণাটি প্রধানমন্ত্রী যে এই সময়েই করবেন — একথা জেপিএ তার প্রচারপত্র মারফৎ সরকারি কর্মচারীদের আগেই জানিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি ভেবে থাকেন যে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা শুনেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আগামী ১ মার্চ থেকে তাদের প্রস্তাবিত অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট, আইন অমান্য, কর্মবিরতি ও অফিস অবরোধ প্রভৃতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবেন, তাহলে তিনি ভুল করছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি একথা ঠিক, কিন্তু আসন্ন ধর্মঘট ও আন্দোলনের মূল দাবিগুলি হল — সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া, আয়তন কমানো, কর্মী ও কর্মসংকোচন, অর্জিত অধিকার হরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া বন্ধ করা, বেসরকারীকরণ ও নিগমীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা, নয়া পেনশন স্কিম প্রত্যাহার এবং জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন প্রভৃতি। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।''

মেদিনীপুরে কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের আমরণ অনশনে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবীদের সংবর্ধনা

অ্যাবেকা আহূত আমরণ অনশন আন্দোলনের চাপে সরকার বেশ কিছু দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। কৃষকদের এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে সামিল হয়ে অনশনে অংশ নিয়েছিলেন খড়্গপুর শহরের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একজন খড়্গপুর কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক দেবাশীষ আইচ, অন্যজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী। এঁদের সংবর্ধনা জানাতে ২৮ জানুয়ারি ইন্দা পেট্রল পাম্পের সামনে বিশিষ্ট শিক্ষক বিমল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গৌরীশঙ্কর দাস, সাংবাদিক মৃণাল সৎপথী প্রমুখ। পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানান এ আই ডি এস ও, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, সেকেন্ডারি টিচার্স ফ্রন্ট, শিশুদের সংস্থা 'উদ্ভাস', এ আই ডি ওয়াই ও, খড়্গপুর সায়েন্স ক্লাব, এ আই এম এস এস এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিবেকানন্দ সাহু।

শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার চক্রান্ত এবং স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে

শিক্ষা কনভেনশন

১৪ ফেব্রুয়ারি, বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে (কলেজ স্কোয়ার), বিকাল ৩টা

বক্তা ঃ অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in